প্রতিরোধের চটি-বই ২

বাংলা ভেঙে টুকরো করা গর্বের?
বাঙালিকে ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এ পোরা গর্বের?

বিপ্লব নায়ক ● সজল রায়চৌধুরী
সমীর কর্মকার ● অর্ঘ্যদীপ সরকার

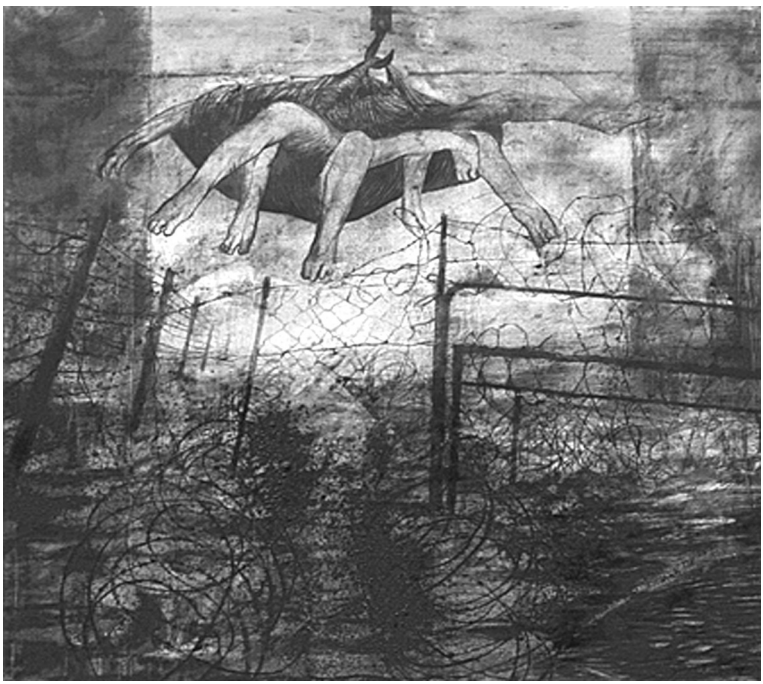

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রতিরোধের চটি-বই ২

বাংলা ভেঙে টুকরো করা গর্বের?
বাঙালিকে ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এ পোরা গর্বের?

বিপ্লব নায়ক ● সজল রায়চৌধুরী
সমীর কর্মকার ● অর্ঘ্যদীপ সরকার

অন্যতর পাঠ ও চর্চা

প্রতিরোধের চটি-বই ২

বাংলা ভেঙে টুকরো করা গর্বের?
বাঙালিকে ‘হোল্ডিং সেন্টার’-এ পোরা গর্বের?

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০২৬

প্রকাশক
বিপ্লব নায়ক
অন্যতর পাঠ ও চর্চা
১২৫, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড
কলকাতা ৭০০০৪৭

প্রচ্ছদচিত্রের চিত্রকর
অরিন্দম চ্যাটার্জি

বিনিময় মূল্য: ২০ টাকা

সূচিপত্র

হোল্ডিং সেন্টার ও পুশ-ব্যাক: হিন্দুত্ববাদীদের তৈরি নরকে স্বাগত	বিপ্লব নায়ক	৭
কর্তিত বাংলা ও ২০ জুনের মহোৎসব	সজল রায়চৌধুরী	২১
বাংলা ভাগের কলঙ্ক? নাকি, কৃতিত্ব? কারা কোনটার কেন দাবিদার?	সমীর কর্মকার	৩১
আমার ব্যক্তিগত অরাজনৈতিক ঘ্যানঘ্যান	অর্ঘ্যদীপ সরকার	৪০

হোল্ডিং সেন্টার ও পুশ-ব্যাক:
হিন্দুত্ববাদীদের তৈরি নরকে স্বাগত

বিপ্লব নায়ক

৫ই জুন, ২০২৬। ভারত-রাষ্ট্রের সীমা সুরক্ষা বল বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা সংক্ষেপে বিএসএফ দশজন মানুষকে, যাদের মধ্যে তিনজন শিশু, পঞ্চগড় এলাকার ভারত-বাংলাদেশ-সীমানা দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করে, অভিযোগ যে তারা বাংলাদেশী। উল্টোদিকের বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বা সংক্ষেপে বিজিবি তাদের দিকের সীমানা বন্ধ রেখে এদেরকে ঢুকতে দেয়নি, তাদের বক্তব্য এই যে এরা বাংলাদেশী তার যথেষ্ট প্রমাণ নেই, এ-ব্যাপারে চালু অন্তঃ-রাষ্ট্র নিয়ম ও আইনি পদ্ধতিও মানা হচ্ছে না। দুই দেশের সীমান্ত-কাঁটাতারের মাঝে এক-ফালতি নো-ম্যানস্-ল্যান্ড বা শূন্যরেখায় খোলা আকাশের নীচে কাদা-মাটি-ঘাস-ঝোপঝাড়-এর মধ্যে, কখনও রোদ কখনও বৃষ্টি মাথায় করে এই দশজন টানা তিনদিন পড়ে থাকে। দুদিকে দুই রাষ্ট্রের বন্দুকধারী সীমানা-পাহারাদারদের বন্দুক তাক করা তাদের দিকে, যেন হঠাৎ-দেশহীন-হয়ে-যাওয়া এই মানুষরা কোনোদিকের ‘দেশ’-এই ঢুকে পড়তে না পারে।

শূন্যরেখায় দিন-কাটানোর সময় কোনো এক ক্যামেরাধারী তাদের একটা ছবি তুলেছিল, ছবিটা এইরকম

তারপর বিএসএফ তাদের নিয়ে নাকি কোনো হোল্ডিং সেন্টারে তুলেছে।

হোল্ডিং সেন্টারটা আবার কী? হ্যাঁ, এটা নতুন বস্তু। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে সরকার দখল করার পর এই বস্তুটির আমদানি হয়েছে। ২৪ মে ২০২৬ রাতে নতুন বিজেপি সরকার এক নির্দেশিকা জারি করে প্রতিটি জেলায় হোল্ডিং সেন্টার তৈরি করে চালু করার নির্দেশ দেয়। মালদা ও মুর্শিদাবাদে প্রথম হোল্ডিং সেন্টার চালু হয়ে যায় ২৫ মে থেকেই। দুই সপ্তাহের মধ্যে বিভিন্ন জেলায় ১১টি হোল্ডিং সেন্টার কাজ করতে শুরু করে। এখনও নতুন নতুন জায়গায় তৈরি হয়ে চলেছে। সরকার বা পৌরসভার কোনো বাড়ি অধিগ্রহণ করে আধাসেনা-পুলিশ-বিএসএফের বন্দুকধারীদের পাহারায় ঘিরে নতুন এক ধরনের জেলখানা এগুলো। তবে জেলখানাতে যাদের বন্দি করা হয় তাদের কোর্টে তোলার ও আইনি বিচারের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে চল আছে, এখানে তা বাদ। অর্থাৎ, বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে কাউকে ধরা হলে তাকে এই হোল্ডিং সেন্টারে আনা হবে, কোর্টে কোনো আইনি বিচারপদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাওয়া হবে না, বিএসএফ নিজেই দ্রুত কয়েকদিনের মধ্যে ঠিক করে ফেলবে এরা বাংলাদেশী মুসলিম বা বর্মী রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী কিনা এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কোথাও একটা নিয়ে গিয়ে ঠেলে ওপারে পাঠিয়ে দেবে, যার সরকারি নাম দেওয়া হয়েছে 'পুশ-ব্যাক'। বিজেপি যেহেতু হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ গড়তে চায়, তাই গরিব মুসলমান হলেই এখন ভয়ঙ্কর বিপদ,

বিজেপি ক্যাডার ও পুলিশের যৌথ বাহিনী যে কোনো সময় তাকে পরিবার-সুদ্ধ গ্রেফতার করে হোল্ডিং সেন্টারে ঢুকিয়ে দিতে পারে। এবং হচ্ছেও তাই। নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী খুব গর্ব করে জুনের দ্বিতীয় সপ্তাহতেই বলেছিলেন যে তাঁর সরকার চার হাজার আটশো জনকে পুশ-ব্যাক করে দিয়েছে আর তখনও হোল্ডিং সেন্টারে আটশো ছত্রিশ জন আছে, তাদেরও পুশ-ব্যাক করে দেওয়া হবে। তিনি আরো বলেছেন যে বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের কোনো ভয় নেই, তাদের সিএএ আইনের মাধ্যমে তিনি হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের অংশ করে নেবেন। হোল্ডিং সেন্টার গঠন ও অনুপ্রবেশকারী বলে সন্দেহভাজন গরিব মুসলমানদের সেখানে এনে তোলা, পুশ-ব্যাকের চেষ্টা তারপর থেকে চলছে তো বটেই, আড়ে-বহরে আরো বাড়ছে।

এই পরিস্থিতির কোনো আঁচ বাজারি সংবাদপত্র বা টিভি-মিডিয়ায় পাওয়া যাচ্ছে না, সেখানে শাসকদলের তৈরি-করে-দেওয়া নানা অ্যাজেন্ডা ঘিরে নির্বোধ নাচন-কোঁদন চলছে, এইসব মিডিয়াম্যান-জোকারদের দেখলে এখন ঘেন্না লাগে, তাদের কথা আলোচনা করে ফালতু সময় নষ্ট করব না। আঁচ পাওয়ার জন্য তাই আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে জুন মাসের শুরুর দিকে মালদা গিয়েছিলাম, যেখানে প্রথম হোল্ডিং সেন্টার দুটির একটি শুরু হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে, বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে যা জানতে পেরেছি প্রথমে সে-কথা বলি।

মালদার ইংলিশবাজারে ২৫ মে সকালে হোল্ডিং সেন্টার চালু হয়েছিল ৯ জন বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী সন্দেহভাজনকে তুলে আনার মধ্য দিয়ে। এদের তুলে আনা হয়েছিল গাজোল ব্লকের পাণ্ডুয়া থেকে। এদের মধ্যে দুজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা, বাকিরা অপ্রাপ্তবয়স্ক বা শিশু। দুটি গরিব মুসলমান পরিবারের লোকজন। এদের পরিবারের পুরুষরা পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে বাঙ্গালোরে কার্যরত ছিল, ফলে ধরপাকড়ের সময় তারা উপস্থিত ছিল না। যারা উপস্থিত ছিল, চেঁছেপুঁছে সবাইকে ধরে আনা হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই এদের পুশ-ব্যাক করার জন্য হোল্ডিং সেন্টার থেকে নিয়ে চলে যাওয়া হয়। এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ওঠে। পুশ-ব্যাকের জন্য নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে মানে বিএসএফের বন্দুকধারীরা খতিয়ে দেখে নিশ্চিত হয়ে গেছিলেন যে এরা অবৈধভাবে ঢোকা বাংলাদেশী। কিন্তু এদের পরিবারের পুরুষরা তখনও এসে পৌঁছয়নি, বাইরে কাজ করতে যাওয়ার সময় তাঁরা নিশ্চয়ই পরিচয়পত্র ও আইনি কাগজসমূহ নিজেদের সঙ্গে

নিয়ে গিয়েছিলেন, কারণ বাংলার বাইরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে (বিশেষ করে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলোতে) কোনো পরিযায়ী শ্রমিককে বাংলায় কথা বলতে দেখলেই বাংলাদেশী বলে হেনস্থা মারধোর করা, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া এবং তারপর বিএসএফের তৎপরতায় বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার ঘটনা গত প্রায় এক বছর ধরেই ঘটে চলেছে (বীরভূমের সোনালী বিবিকে পরিবারসমেত এভাবেই বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, ওপারের জেল-এ তাঁদের ঠাঁই হয়েছিল, কোর্টে মামলা-মোকদ্দমা হওয়ায় সোনালী বিবি ফিরতে পেরেছেন কিন্তু তাঁর স্বামী এখনও ফিরতে পারেননি, এমন ঘটনা বহু), তাই বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের, বিশেষ করে যদি মুসলমান হয়, টান-টান ভয় ও উদ্বেগের মধ্য দিয়ে এমনিতেই যেতে হচ্ছে। সুতরাং গাজোলের পাণ্ডুয়া থেকে ধৃত ওই নয়জন মহিলা ও শিশুর পরিবারের পুরুষদের কাছে থাকা পরিচয়পত্র ও আইনি কাগজ না পরীক্ষা করেই বিএসএফ কীভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে যে এরা সবাই অবৈধ অনুপ্রবেশকারী? তাহলে কি হোল্ডিং সেন্টারে তুলে এনে নাগরিকত্বের বৈধতা-অবৈধতা যাচাইয়ের কথাটা কেবলই গপ্পো, আগে থেকেই সিদ্ধান্ত করে রাখা হয়েছে যে যাদের তুলে আনা হবে তারা সবাই বাংলাদেশী?

ওই ধৃত নয়জনের পরিবারের পুরুষরা খবর পেয়ে তড়িঘড়ি বাঙ্গালোর থেকে মালদায় এসে পৌঁছয়। কিন্তু তাঁরা গাজোলের পাণ্ডুয়ায় তাঁদের বাড়ি অবধি পৌঁছতে পারেননি, মালদা রেলস্টেশন থেকেই তাঁদের গ্রেফতার করা হয় এবং সোজা নিয়ে তোলা হয় মালদার হোল্ডিং সেন্টারে, যেখান থেকে তাঁদেরও পুশ-ব্যাক-এর জন্য নিয়ে চলে যাওয়া হয়।

গাজোলের পাণ্ডুয়ার যেখান থেকে এই প্রথম নয়জনকে তোলা হয়েছিল, সেই এলাকায় গেলে দেখা যায় যে তা গরিব মুসলমানদের এক বসতি অঞ্চল, প্রায় সবাই নানাভাবে খেটেখুটে রোজগার করে কোনোরকমে দিন গুজরান করেন। সেখানে এখন কোনো মানুষই এই তুলে-নিয়ে-যাওয়া নয়জন সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি নয়, ভয়ঙ্কর এক সন্ত্রাসের বোধ তাঁদের উপর চেপে বসেছে। তাঁদের চোখের তারায় সন্দেহ-অবিশ্বাস-আতঙ্ক আর মুখে বলছেন যে তাঁরা কিছুই জানেন না। ঘটনাটি ঘটার পর অনেক পরিযায়ী শ্রমিক ফিরে এসে তাদের গোটা পরিবারকে নিয়ে তাদের কাজের জায়গায় চলে গেছে, অর্থাৎ, এই বাংলার থেকে বাইরের সেই রাজ্যও এখন তাদের কাছে বেশি নিরাপদ বলে বোধ হচ্ছে।

প্রথম গ্রেফতার হওয়া নয়জন ও তারপর তাদের পরিবারের পুরুষদের যে পুশ-ব্যাক করে দিয়েছে বলে বিএসএফ বলছে, তা সীমান্তের কোন অঞ্চল দিয়ে তাদের পুশব্যাক করা হয়েছে? বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে এখন তারা আছে? এর কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। বাংলাদেশের সংবাদপত্রে বা বিজিবি-র কোনো বিবৃতি থেকেও এদের বাংলাদেশে পুনর্বাসন হওয়ার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

সোজা-সাপটা তথ্যের অভাব কেবল এই ক্ষেত্রেই নয়, সমস্ত ক্ষেত্রেই ক্রমে প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে উঠছে। যেমন ধরুন, মালদার হোল্ডিং সেন্টারে ২৫ মে-র পর ৩০ মে রাতে আরো ৬ জনকে এনে তোলা হয়েছিল, কিন্তু কোথা থেকে তাদের ধরে আনা হয়েছে তা আর জানানো হয়নি। আর তারপর থেকে নিরন্তর লোকজনকে ঢোকাতে ও বের করতে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কতজনকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে আর কতজনকে বের করে কোথা দিয়ে পুশ-ব্যাক করা হচ্ছে তার কোনো হিসেব আর জানানো হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে যে সরকারিভাবেই বিএসএফ ও হোল্ডিং-সেন্টার-পরিচালকরা এই নীতি নিয়েছেন।

স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে জানা গেল যে ৪ জুন মালদার হোল্ডিং সেন্টারে বাইরে থেকে বাসে করে প্রচুর লোককে নিয়ে আসা হয়েছিল। কলকাতার দিককার চারটে বাসে করে মহিলা-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ মিলে সংখ্যাটা প্রায় দুশোর মতো হবে। কোথা থেকে তাদের ধরা হয়েছে জানা যায়নি। পুলিশ সুপার অনুপম সিং কেবল এইটুকু বলেছেন যে উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের হাকিমপুর সীমান্ত দিয়ে এদের পুশ-ব্যাক করতে গিয়ে বিজিবি-র বাধায় করতে না পারায় ও ওইদিককার হোল্ডিং সেন্টারগুলোয় অতিরিক্ত ভিড় হয়ে যাওয়ায় তাদের মালদা সহ অন্য বিভিন্ন জেলার হোল্ডিং সেন্টার-এ সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এবার তাহলে পুশ-ব্যাক বস্তুটির উপর নজর দেওয়া যাক। ভারত ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রদুটির মধ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী প্রত্যর্পণের যে উভয়-মান্য রীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল, বিজেপি সরকার এই পুশ-ব্যাক-পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তা মানতে নারাজ। সেই প্রতিষ্ঠিত রীতিতে, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে কেউ ধরা পড়লে তাকে জেলে রাখা হতো, কোর্টে তোলা হতো, কোর্টে তাকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনের ও সরকারি কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ প্রমাণের পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হতো, সে বিচারে অভিযোগ প্রমাণিত হলে তবেই তার মূল দেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রমাণ দাখিল করে প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়া শুরু করার

আবেদন করা হতো এবং তারপর দুই দেশের রাষ্ট্রের সহযোগিতাক্রমে সীমান্তে প্রত্যর্পণ অনুষ্ঠিত হতো। এই আইন যে সর্বত্র নিখুঁতভাবে মানা হতো তা নয়, কিন্তু তবুও এর মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজেকে অভিযোগ-মুক্ত করার একটা সুযোগ ছিল। এই সুযোগটাই আর বিজেপি সরকার রাখতে চায় না। অসম রাজ্যের বিজেপি সরকার বিদেশি বিতাড়নের নামে বহু বাংলাভাষী, বিশেষত মুসলমানদের নাগরিকত্ব হরণ করে ডিটেনশন ক্যাম্পে পুরে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ না দিয়ে গায়ের জোরে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার কাজ চালিয়ে আসছে গত প্রায় দশ বছর জুড়ে। এনিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে বিরোধও পেকে উঠেছে, এই অনাচারের বহু বিশদ নথিভুক্তিকরণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনগুলোর নানা প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে। তাছাড়া, আগেই বলেছি, ভারতের অন্য বহু বিজেপি-শাসিত রাজ্যের সরকারও গত প্রায় এক বছর ধরে বাংলাভাষী গরিব পরিযায়ী শ্রমিক দেখলেই বাংলাদেশী বলে চিহ্নিত করে বিএসএফের হাতে তুলে দিয়ে বিনা বিচারে বাংলাদেশে ঠেলে দেওয়ার তুঘলকী কাণ্ড ঘটিয়ে আসছে। এবার পশ্চিমবঙ্গে নতুন ক্ষমতায় এসে বিজেপি এই তুঘলকী কাণ্ডকেই নতুন উচ্চতায় তুলে নিয়ে যাচ্ছে। বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় এসেই চায়ের দোকানে বসে বাজার গরম করার ঢঙে বলে দিয়েছেন যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ধৃতরা কেউ আমাদের জামাই নয় যে তাদের জেলে বসিয়ে কোর্টে বিচার শেষ হওয়ার অপেক্ষায় মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর ভাত-মাছ-ডিম খাইয়ে আমাদের পয়সা নষ্ট করতে হবে, তাই এদের ধরে জেল-টেল নয়, একেবারে হোল্ডিং সেন্টারে তোলা হবে ও বিএসএফ দিনকয়েকের মধ্যে সব ভেরিফিকেশন-টেরিফিকেশন সাঙ্গ করে সীমান্তের ওদিকে চালান করে দেবে। একেই নাম দেওয়া হয়েছে পুশ-ব্যাক। সরকারি নির্দেশ থেকে জানা যাচ্ছে যে এই প্রতিটা হোল্ডিং সেন্টার থেকে প্রতি ১৫ দিন অন্তর রিপোর্ট পাঠাতে হবে ভারতরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র দফতরে যে কতজনকে ধরা হলো ও কতজনকে পুশ-ব্যাক করা হলো। কিন্তু এই কোনো তথ্যই জনপরিসরে সবার জানার জন্য হাজির করার কোনো সদিচ্ছা সরকারের দেখা যাচ্ছে না। হোল্ডিং সেন্টারগুলোয় যাদের এনে তোলা হচ্ছে তাদের কোথা থেকে ধরা হয়েছে, কতজনকে ধরা হয়েছে, তাদের নাম-পরিচয় কী, তাদের হোল্ডিং সেন্টার থেকে যখন বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পুশব্যাক করলে কোথা দিয়ে পুশব্যাক করা হচ্ছে, বাংলাদেশে তারা

গৃহীত হচ্ছে কিনা, এই কোনো তথ্যই জানানো হচ্ছে না। আমরা ব্যক্তিগতভাবে নাগরিক হিসেবে একাধিক পুলিশ অফিসার ও বিডিও-র কাছে এই তথ্য চেয়ে উত্তর পেয়েছি যে এগুলো 'সেনসিটিভ' (স্পর্শকাতর) তথ্য তাই জানানো যাবে না, অনেকে আবার বলেছেন যে তাঁরা নিজেরাই এসব তথ্য পাচ্ছেন না। তাই বোঝা যাচ্ছে যে সরকারিভাবেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সবাইকে জানানো হবে না—বিএসএফ, আধাসামরিক বাহিনী ও উপর-মহলের কিছু মন্ত্রী-আমলার মধ্যে সবকিছু সীমাবদ্ধ রেখে এই তুঘলকী কাণ্ডটি চালিয়ে যাওয়া হবে। সংবাদপত্র ও গণজ্ঞাপনমাধ্যম-ও এ নিয়ে মোটামুটি চতুর নীরবতা রক্ষা করে চলেছে।

ওদিকে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে এবং বাংলাদেশ সরকার ও বিজিবি-র মুখপত্রদের নানা বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে যে বাংলাদেশ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ এই পুশ-ব্যাক (তাদের ভাষায় পুশ-ইন) মোটেই মেনে নিচ্ছে না, সরকারিভাবে তা তারা একাধিকবার ভারতরাষ্ট্রকে জানিয়েও দিয়েছে, বিএসএফ ও বিজিবি-দের যৌথ সভাতেও এই আপত্তি জানিয়ে রেখেছে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের দাবি যে প্রত্যর্পণ করতে হলে তা মান্য আইন ও প্রক্রিয়া মেনেই করতে হবে, তারা অভিযোগ করছে যে সীমান্ত বরাবর ভারত-রাষ্ট্র গা-জোয়ারি করে লোক ঢুকিয়ে দিতে চাইছে এবং এই গা-জোয়ারি তারা মানবে না ও প্রতিরোধ করবে। বাংলাদেশে সংবাদপত্র থেকে এ-ও জানা যাচ্ছে যে এই প্রতিরোধের কাজে কেবলমাত্র বিজিবি বন্দুকহাতে সীমানা পাহারা দিচ্ছে তা নয়, সেখানে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর মানুষদের মধ্যে 'সচেতনতা-প্রচার' চালিয়ে সেইসব সাধারণ মানুষদেরও রাতদিন সীমানা পাহারা দেওয়ার কাজে শামিল করা হচ্ছে। বাংলাদেশী সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকেই জানা যাচ্ছে এই 'সচেতনতা-প্রচার'-এর রূপ: সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোর সাধারণ মানুষদের কাছে প্রচার করা হচ্ছে যে শত্রুভাবাপন্ন ভারতরাষ্ট্র বাংলাদেশে অশান্তি ও অস্থিরতা তৈরির জন্য ও উন্নয়নে বাধা প্রদানের জন্য 'ভারতীয় রোহিঙ্গা'-দের ঠেলে ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যে-কোনো-মূল্যে তা আটকাতে হবে।

রোহিঙ্গা হলো মায়ানমার দেশের এক জনজাতি, তাদের মুখের ভাষা বাংলার খুব কাছাকাছি হলেও পুরো এক নয়, মায়ানমার রাষ্ট্রে তারা সংখ্যালঘু ছিল, সংখ্যাগুরু বর্মী জনজাতি ও মায়ানমার রাষ্ট্রের যৌথ আক্রমণে বছর-দশেক আগে তারা বাস্তুভিটে-সম্বল সব হারিয়ে তাদের দীর্ঘদিনের বসতির গ্রামগুলো ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। তাদের গ্রামের পর গ্রাম আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়ে

আধিপত্যকারী বর্মী জনজাতিরা দখল করে নেয়। পালাতে গিয়ে বহু রোহিঙ্গা নৌকাডুবি হয়ে সাগরে মারা গেছে। তাদের সিংহভাগ বাংলাদেশেরই চট্টগ্রাম অঞ্চলের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ভারতেও সেই সময় কিছু রোহিঙ্গা এসেছিল, দিল্লীতে তাদের একটি উদ্বাস্তু শিবিরও গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা ধর্মে মুসলমান বলে ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা তাদের বিরুদ্ধে লাগাতার আক্রমণ ও অপপ্রচার লাগু করে, সরকারে হিন্দুত্ববাদী বিজেপি গেঁড়ে বসার পর তাদের হেনস্থা ও তাড়া-করে-খেদানো শুরু হয়, ফলে ভারতে এখন আর রোহিঙ্গা উদ্বাস্তু নেই বললেই চলে। বিশ শতকের মাঝে এমনই রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে উদ্বাস্তু হওয়া তিব্বতীদের জন্য নতুনভাবে থাকা ও বাঁচার দরজা খুলে দিয়ে যে ভারত সহমর্মীতা-কুটুম্বিতার নতুন মানবিক নিদর্শন হয়ে উঠেছিল, আজ একুশ শতকে এসে ধর্মীয় ঘৃণার বিষে জর্জর হয়ে সে অসহায় রোহিঙ্গাদের উপর ঘৃণা-বিদ্বেষ-হিংসার রাষ্ট্ররোষ দেখিয়ে চূড়ান্ত অমানবিকতার পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছে। এ লজ্জা আমাদের সবার। আর বাংলাদেশ রাষ্ট্রও যে রোহিঙ্গাদের খেদিয়ে-বেড়ানোর মতো মানবেতর কোনো জন্তু হিসেবেই দেখছে, গোঁড়া মুসলিম আইনকানুন প্রবর্তন নিয়ে সেখানে এতো উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গেলেও বিপদে-পড়া মুসলমান পড়শিদের জন্য সেখানেও যে সহানুভূতি-সমবেদনা নিরক্ত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে, 'ভারতীয় রোহিঙ্গা' শব্দবন্ধ উদ্ভাবন ও তাদের শত্রু রূপে দেখার মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে হিংসা-দ্বেষ-এ উন্মত্ত দুই জাতিরাষ্ট্রের সাঁড়াশি-চাপে পড়ে পুশ-ব্যাক হওয়া মানুষগুলোর মর্মান্তিক পরিণতির ছবি এখন তৈরি হয়ে চলেছে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মধ্যবর্তী নো-ম্যানস-ল্যান্ড বা শূন্যরেখা বরাবর। সেইরকম একটি ছবি দিয়েই এই লেখা শুরু করেছিলাম। এবার সেই ছবিগুলোর দিকে আরো বিশদে তাকানো যাক।

৪ জুন দেখা গিয়েছিল যে হবিবপুর ব্লকের আশরাফপুর সীমান্তে ভারত ও বাংলাদেশ দুই রাষ্ট্রের কাঁটাতারের মাঝের শূন্যরেখায় ২৮ জন মানুষ বসে রয়েছে। একদিকে বন্দুক উঁচিয়ে বিএসএফ যারা তাদের ভারতের দিক থেকে ঠেলে এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। আর অন্যদিকে বন্দুক উঁচিয়ে বিজিবি, সঙ্গে মারমুখী বাংলাদেশী জনতা, যারা কোনোমতেই এদের বাংলাদেশে ঢুকতে দেবে না।

এই একই ছবির পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে সীমান্তের আরো বহু জায়গায়: উত্তর চব্বিশ পরগণার হাকিমপুর, মালদার আশরাফপুর, উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর, কুচবিহারের গীতালদহ, ...।

বাংলাদেশের সংবাদ পোর্টাল এশিয়া পোস্ট, প্রেস টিভি, কালবেলা-য় বিজিবি-র এক অধিকর্তাকে উদ্ধৃত করে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়: ১ জুন ভারতের হাকিমপুর সীমান্ত সংলগ্ন বাংলাদেশের সাদিপুর মাঠে ১২ জনকে দেখা গিয়েছিল, বিএসএফ এদের ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, বিজিবি পাল্টা পাহারা দিচ্ছিল যাতে এরা বাংলাদেশের মধ্যে আর ঢুকতে না পারে, টানা দুদিন তারা এভাবে পড়ে ছিল, দুদিন পর বিজিবি এক সকালে খেয়াল করে যে তাদের পোঁটলা-পুঁটলি সব মাঠে ছড়িয়ে পড়ে আছে, কিন্তু মানুষগুলোর কোনো হদিশ নেই, ফাঁকতালে কোনোভাবে তারা বাংলাদেশে ঢুকে গেছে কিনা দেখতে বিজিবি সীমান্তবর্তী সব গ্রামে চিরুনি-তল্লাশি চালায়, এমনকি ড্রোন উড়িয়েও তল্লাশি করা হয়, কিন্তু কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এখন প্রশ্ন হলো, এই ১২ জনের কী হলো? বিএসএফ সাধারণভাবে বলছে যে পুশ-ব্যাক করতে চাওয়া 'অনুপ্রবেশকারীদের' বিজিবি-র বাধায় পুশ-ব্যাক করতে না পারলে বিএসএফ আবার তাদের নিয়ে অন্য কোনো হোল্ডিং সেন্টারে তুলছে সীমান্তের অন্য কোথাও দিয়ে পুশ-ব্যাক করার জন্য। এই ১২ জনের ক্ষেত্রে যদি তাই-ই হয় তাহলে তাদের পোঁটলা-পুঁটলিতে বাঁধা তাঁদের শেষ সম্বলটুকু মাঠে পড়ে রইলো কেন? এই শেষ সম্বলটুকু আঁকড়ে ধরেই তো তাঁরা আশ্রয়চ্যুত হয়ে হোল্ডিং সেন্টারের জেলখানা থেকে অজানা অন্ধকারের দিকে যাত্রায় টিকে থাকতে চেয়েছিলেন, এগুলো তো তাঁরা প্রাণ থাকতে ফেলে যাবেন না। তাহলে কি তাঁদের খুন করে লাশ গায়েব করে দেওয়া হয়েছে? তা হয়ে থাকলে, কে তাঁদের গুম-খুন করলো: বিএসএফ নাকি বিজিবি?

জুন থেকে শুরু হয়ে লাগাতার এ-ঘটনা ঘটে চলেছে প্রতিদিন সীমান্তের নানা স্থানে। শূন্যরেখায় বসে-থাকা পুরুষ-মহিলা-শিশু-বৃদ্ধের ছবি মাঝে-মধ্যে ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ ঘুরে আমাদের মোবাইলেও এসে হাজির হচ্ছে। তা দেখছি আমরা, একে-অপরকে পাঠাচ্ছি, মন্তব্য সেঁটে দিচ্ছি, চতুর-ফোন-এর উজ্জ্বল নীল আলোয় আমাদের ভাষার জেল্লায় তা কেবল উপভোগ্য কিছু সংকেত-বিনিময় হয়ে থাকছে, কোথাও কোনো বুক-ফাটা-বেদনা নেই, মেনে-নিতে-না-পারা-র অস্থিরতা নেই, নিজেদের সাজানো-গোছানো নিরাপদ অবস্থানের মধ্যে বসে তার সীমানার বাইরে কোনো বাঘের হরিণ-শিকার ও সেই শিকারের রক্তে সব ঝর্ণার জলের রঙ লাল হয়ে যেতে দেখে আমরা যেন ট্যুরিস্ট-সুলভ-চোখ-এ নিসর্গদৃশ্য দেখে চলেছি, আর মাঝে-মধ্যে আমাদের এই স্বর্ণখচিত সভ্যতার

সুছাঁদ পানপাত্র ছাপিয়ে ভিতরের গরল ফেনিল উচ্ছ্বাসে উপছিয়ে পড়ছে। না, আমি এখানে ভাষার জেল্লা মাখিয়ে কাব্য করছি না, গরল বলতে কী বলছি তার কিছু নমুনা তুলে ধরি—হয়তো আপনারাও আপনাদের চতুর-ফোনে এগুলো দেখেছেন, তবু আরো একবার এগুলোর চোখে চোখ রেখে দাঁড়ান।

শূন্যরেখায় দিনের পর দিন খাওয়া-দাওয়া-জল ছাড়া বসে থাকা এক বছর বারো-তেরো-র মেয়ের অসহায় আর্তি 'সারাদিন জল নেই...খাওয়া নেই... গা-ধোয়া নেই...এভাবে বসে থাকা...' আর তার কান্নায় ভেঙে পড়ার একটা 'ভিডিও-ক্লিপ' চতুর-ফোনে খুব ছড়িয়েছিল, আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন। অনেকে সহানুভূতি প্রকাশ করে তা 'শেয়ার' করেছিল। তারপরই মন্থন-জাত গরল উঠে এলো। আমি কারও নাম উল্লেখ করছি না, তাদের মন্তব্যগুলো শুধু উল্লেখ করছি, কারণ শিক্ষিত-মধ্যবিত্ত/উচ্চবিত্ত হলেই এহেন গরলধারীদের কোনো মনুষ্য-নাম-উপযুক্ত বলে আমি মনে করি না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কারসাজিতে দক্ষ একজন মেয়েটির ছবি ব্যবহার করে তার মুখে হাসি সেঁটে কমিকস-এর ঢঙে তার মুখে এই কথাগুলো বসালো: 'হোল্ডিং সেন্টার-এ বসে-বসে হারামে ভাত-মাছ খাওয়ার সুখই আলাদা'। কৃত্রিম-বুদ্ধিমত্তা-বাগীশ এই মহাজনকে ধরে হোল্ডিং সেন্টারে নিয়ে গেলে তিনি এই সুখ উপভোগ করার আনন্দে নাচতে নাচতে সেখানে যাবেন তো? নাকি তিনি নিজেকে মানুষ মনে করেন আর এই অভাগা মেয়েটিকে না-মানুষ কোনো জন্তু-জানোয়ার মনে করেন, তাই তাঁর সুখ-এর মাপে এই মেয়েটির সুখ মাপেন না? আরেকজন অতি-শিক্ষিত করপোরেট-চাকরি-ধারী বীরপুরুষ মন্তব্য করেছেন: এসব লোকগুলোকে আগেকার দিনের দাস-বাজারের মতো নীলামে তুলে বিক্রি করে দিলে দেশের উন্নতি হবে কারণ করপোরেটরা এদের কিনে নিয়ে এদের শরীর থেকে দাস-শ্রম নিঙড়ে নেবে, তাতে জিডিপি বাড়বে। এই মহা করপোরেট-বাগীশের ফেসবুক-পোস্ট-এ মন্তব্য জুড়ে আরো বিকল্প পন্থার হদিশ দিয়েছেন আরো কিছু শিক্ষিত ব্যক্তি। একজন বলেছেন এদের গিনিপিগ করে বিভিন্ন ওষুধের ট্রায়াল চালানো উচিত, আরেক সাজ-পটীয়সী মহিলা বলেছেন এদের মেরে ফেলে কঙ্কালগুলোকে ডাক্তারি-কলেজের পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত, তাতে ল্যাব-এ কঙ্কালের অভাব ঘুচবে...। পাঠক, চোখে চোখ রেখে তাকান আপনারই চারদিকে আপনারই মতো তথাকথিত সুভদ্র মন্তব্যকারীদের চোখের দিকে? কী মনে হচ্ছে? মানুষ অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক হয়ে উঠে সেই

কবেই না অন্য সমস্ত প্রজাতির প্রাণীদের সহ গাছপালা-নদনদী-বাতাস-মাটি সবকিছুকে নিজেদের আরাম-আয়াস-সাধন-যজ্ঞে নির্বিচারে ধ্বংস-ধ্বস্ত করার সংবেদনহীনতা স্বাভাবিক করে নিয়েছিল, আজ কি আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে মানুষের-ই মধ্যেকার সুযোগ-সুবিধা-ধারী ক্ষমতালগ্ন একটা অংশ বাকি সমস্ত অংশকে একইভাবে ধ্বংস-ধ্বস্ত করাকে একইরকম বৈধ বলে 'নতুন-স্বাভাবিকতা' হাজির করতে চাইছে? মানুষের এই সংবেদনহীন স্বার্থপর পশু হয়ে-ওঠা-র বিবর্তনে আপনিও কি শরিক? হ্যাঁ, হয়তো আপনি এমন 'পোস্ট' করেননি; এমন খুন-করা, গিনিপিগ-করা, দাস-শ্রমিক-করা বাকতাল্লা থেকে সরকারি নীতি হয়ে-ওঠার পথে এগোলে আপনি হয়তো একটা-দুটো প্রতিবাদী সেমিনার বা মিছিল (তাও পুলিশ-পারমিশন পেলে) করবেন, ইউরোপীয় ফ্যাসিবাদের সঙ্গে এর তুলনা-প্রতিতুলনা করে রাজনৈতিক তত্ত্বের জ্ঞান জাহির করবেন, কিন্তু তারপর? আপনিও কি অর্থহীন চিহ্ন-সর্বস্ব হয়ে ওঠা এই প্রতিবাদের আচারগুলো সেরে আবার আপনার হিসেব-কষা নিরাপত্তা-বলয়-এর মধ্যে সেঁধিয়ে যাবেন না? আপনার চারদিকে সুযোগ-সুবিধা-আঁকড়ে ক্ষমতার গায়ে সেঁটে থাকতে চেয়ে এই যে আপনার-ই মতো মানুষরা হিংসা-দ্বেষ-ধ্বংস-হত্যার নয়া স্বাভাবিকতায় মশগুল হয়ে উঠেছে, তাদের চোখে চোখ রেখে নিরন্তর প্রতিরোধের কোনো উপায় কী আপনার নেই? আপনিই ভাবুন। ততক্ষণ আমরা একটু চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করি যে যাদের হোল্ডিং সেন্টার-এ পুরে, শূন্য রেখায় ফেলে রেখে মৃত্যু বা দাস-শ্রম বা না-মনুষ্যত্বের অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে দেওয়া হচ্ছে তারা ঠিক কারা?

২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের সদ্য-হয়ে-যাওয়া বিধানসভা নির্বাচনের আগে ভারতের নির্বাচন কমিশন যে বিশেষ নির্বাচক তালিকা সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়েছিল, 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা সংক্ষেপে এসআইআর (বা লোকমুখে 'সার') নামে যা হুলস্থুল বাধিয়েছিল, তা আসলে ব্যাপক হারে নির্বাচকদের নাম বাদ দেওয়ার এক যজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, রেশন কার্ড,... কোনটা দিয়ে যে ঠিক নির্বাচকত্ব প্রমাণ করা যাবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করা হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় 'ডকুমেন্ট'-এর লম্বা তালিকা দেওয়া হচ্ছিল, চোদ্দগুষ্টির অতো 'ডকুমেন্ট' সাধারণ মানুষ অনেকেই জমিয়ে রাখেন না, এতদিন এসবের কোনো দরকারও পড়েনি। নির্বাচন কমিশনের হয়ে কাজ করছিল যে বিএলও-রা তারাও নিশ্চিত

ছিলেন না কী কী 'ডকুমেন্ট' ঠিক নিতে হবে। মালদা জেলার মুথাবাড়ির বাঙ্গিটোলা গ্রামে ঘুরে বেশ কিছু সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি যে তাঁদের কাছে এমন 'ডকুমেন্ট' ছিল যা বিএলও-রা প্রথমে বলেছে দরকার হবে না, অথচ পরে তা দাখিল না করার অজুহাতেই তাঁদের নাম নির্বাচক তালিকা থেকে বাদ গেছে। এই বাঙ্গিটোলা গ্রাম গঙ্গা-ভাঙন এলাকার মধ্যে পড়ে, এখানকার বহু মানুষ ভাঙনের কবলে পড়ে তিন থেকে চারবার বাড়ি ও ভিটে হারিয়ে এখন হয়ত এই চতুর্থ বা পঞ্চমবার আবার নতুন করে বাসা বেঁধেছে। শহুরে বাবুরা যতটা ভাবেন, এঁদের পক্ষে সব 'ডকুমেন্ট' সংরক্ষণ করে রাখা, বা, সব 'ডকুমেন্ট'-এ বানান-টানান সব 'যৌক্তিক সুসঙ্গত' করে রাখা মোটেই ততো সহজ বা স্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এলাকাটি মুসলমান-প্রধান। এখানকার ওয়ার্ডগুলোয় ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ নাম নির্বাচক-তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। গোটা পশ্চিমবঙ্গে এমনভাবে নাম বাদ পড়েছে প্রায় ৯১ লাখ মানুষের, যাদের সিংহভাগ মুসলমান। কোর্টের নির্দেশে এই বাদ-পড়া মানুষদের আপিলের ভিত্তিতে পুনর্বিচারের জন্য 'ট্রাইবুনাল' গঠিত হয়েছিল কলকাতার কাছে জোকায়। সেখানে আপিল করতে পেরেছেন এখনও অবধি বড়জোর ৩৪ লাখ মানুষ। তাদের মধ্যে মাত্র কয়েক হাজারের কেস বিচার হয়েছে, যাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রায় সবারই (৯৬ শতাংশের উপর) নাম বাদ দেওয়া ঠিক হয়নি, তাঁরা বৈধ নির্বাচক। কিন্তু ভোট মিটতে না মিটতেই সেই ট্রাইবুনাল-এর সমস্ত প্রক্রিয়া স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে, আর কোনো বিচার সেখানে হচ্ছে না, নতুন করে ট্রাইবুনালে আপিল করার রাস্তাও দেখা যাচ্ছে না। এর থেকে একটা সহজ হিসেব আমরা করতে পারি। হিসেবটা এরকম: 'সার' করে নির্বাচক তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ৯১ লাখ মানুষের, গড় মৃত্যুহার ধরে নিলে আন্দাজ করা যায় যে এর মধ্যে মৃত্যুর কারণে যথার্থভাবেই নাম বাদ গেছে বড়জোর ৫ থেকে ৬ লাখের, বসত-পরিবর্তনের জন্য ধরা যাক আরো ৫ থেকে ৬ লাখ-এর নামও যথার্থভাবেই বাদ গেছে, তাহলে পড়ে থাকে প্রায় ৮০ লাখের মতো মানুষ, এই ৮০ লাখের মধ্যে ট্রাইবুনালে আপিল করেছেন ৩৪ লাখ, ফলে এই ৩৪ লাখের বিচারাধীন অবস্থানের জন্য তাঁরা কিছু আইনি রক্ষাকবচ পাবেন, পড়ে থাকলো আরো অন্তত ৪৬ লাখ। এই ৪৬ লাখ মানুষ ট্রাইবুনালো এখনও আপিল করতে পারেননি, ট্রাইবুনালকে শীতঘুমে পাঠিয়ে দেওয়ায় তাঁদের করার সম্ভাবনাও এখন নেই, আর এঁদের মধ্যে অন্তত ৯৫ শতাংশ (ট্রাইবুনালে বিচার সম্পন্ন হওয়া

ক্ষেত্রে যে হার দেখা গেছে তা ধরে নিচ্ছি, কারণ এঁরা ট্রাইবুনালে আপিল এড়িয়ে যেতে চাইছেন এমন নয়, যতজনের সঙ্গে কথা হয়েছে তাঁরা আপিল করতেই চান কিন্তু করে উঠতে পারেননি) বৈধ নির্বাচক ও বৈধভাবেই পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক ধরে নিলে তার সংখ্যাটা দাঁড়ায় ৪০ লক্ষের কাছাকাছি। এই ৪০ লক্ষ মানুষের এখন আর কোনো আইনি রক্ষাকবচ নেই, তাঁরা যে এ দেশের নাগরিক তা প্রমাণ করার বিতর্কাতীত কোনো উপায় নেই, এদের সিংহভাগই হলো বাংলাভাষী গরিব মুসলমান, খেটে-খাওয়া-মানুষ। ফলে 'হিন্দু পশ্চিমবঙ্গ' স্থাপন করতে উদগ্রীব বিজেপি সরকারের পক্ষে এদের গায়ে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী তকমা সেঁটে দেওয়া এখন ছেলেখেলার মতো সহজ হয়ে উঠেছে। বিএসএফ, পুলিশ, সরকারি দপ্তর এখন করছেও তাই। হোল্ডিং সেন্টারগুলোর হাঁ-করা-মুখ এদেরই গিলতে চাইছে। মালদায় ধরে নিয়ে যাওয়া প্রথম নয়জন ছিলেন এরকমই, প্রথমে তাঁদের নির্বাচক-তালিকা থেকে ছাঁটা হয়েছে, তারপর তাঁদের বাংলাদেশী বলে 'হোল্ডিং সেন্টার' ও 'পুশব্যাক' নামক অন্ধকার গুহায় অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছে।

অবশ্যই এর সঙ্গে আছে বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে এ-দেশে জীবিকার খোঁজে এসে বসবাস করে যাওয়া মানুষও। কেউ হয়তো কয়েক বছর হলো এখানের কোনো শহরতলীতে এসে বাসা বেঁধে মজুরের কাজ নিয়ে রোজগার করতে শুরু করেছিলেন। কারও জীবনের পুরোটাই বা বেশির ভাগটাই কেটেছে পশ্চিমবঙ্গে, তাঁদের ছেলে-মেয়েদের জন্মও হয়েছে এখানে, এখানকার স্কুলেই তারা ভর্তি হয়েছে, আর তাঁরা কেউ হয়তো রাজমিস্ত্রীর কাজ করেন, কেউ রাজমিস্ত্রীর জোগাড়ে, কেউ কলের মিস্ত্রী, কেউ রঙের মিস্ত্রী, কেউ কাঠের মিস্ত্রী, আবার কেউ হয়তো বাজারে সবজি বা মাছ বিক্রি করেন। এখন যে এলাকায় তাঁরা ঝুপড়ি ঘরে থাকতেন বা ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন, সেখানে হিন্দুত্ববাদী ক্যাডাররা এসে হুমকি দিয়ে তাঁদের পাড়া-পড়শিদের শঙ্কিত করে তুলেছেন, সেই চাপে ঘর হারিয়ে, জীবিকা হারিয়ে তাঁরা এখন বাধ্য হচ্ছেন ছোটো ছেলে-মেয়েদের হাত ধরে সীমানা-গেট-এ গিয়ে হাজির হতে, যদি সীমানা পেরিয়ে এ-পারের নরক হয়ে ওঠা জীবন থেকে পালানো যায়, তাঁদের এতদিনের পরিশ্রম-আশা-স্বপ্ন সব ধ্বংসস্তূপ হয়ে পড়ে থাকছে তাঁদের পিছনে। সীমান্ত তাঁরা পেরোতে পারছেন না, বিএসএফ প্রথমে তাদের 'বায়োমেট্রিক ডেটা' নথিভুক্ত করছে, তারপর জড়ো করে জালে-ঘেরা গাড়িতে ঠেসে পুরে কাছে-দূরের হোল্ডিং সেন্টারগুলোতে এনে বন্দি করছে।

বসিরহাট জেলার হোল্ডিং সেন্টারগুলো এভাবে এতই ঠাসাঠাসি হয়ে গেছে যে অন্য জেলায় হোল্ডিং সেন্টার খুলে নিয়মিত ধৃতদের স্থানান্তরিত করা হয়ে চলেছে। এই স্থানান্তরিতকরণের জন্য খোলা হোল্ডিং সেন্টারগুলোর একটা হয়েছে চাকদায়। খবর পেয়ে আমরা দেখতে গেছিলাম। চাকদার আট নম্বর ওয়ার্ডে পৌর সভার বানানো কপালকুণ্ডলা ভবন জুনের গোড়া থেকে পুরোদস্তুর হোল্ডিং সেন্টার হয়ে গেছে। দু-তলা একটা বাড়ি, সামনে একচিলতে মাঠ, নাতি-উচ্চ পাঁচিলে ঘেরা, দোতলার বারান্দায় ও একতলার গেটে আধা-সামরিক বাহিনী ও পুলিশের যৌথ পাহারা। কাউকে ঢুকতে দেওয়া হবে না, কাউকে বেরোতেও না। বাইরে থেকে ভিতরে বন্দি করা মানুষদের কাউকে দেখাও যাচ্ছে না। বাড়িটি একটি সাধারণ পাড়ার মধ্যে। বাড়িটির সামনের দুটো বসতবাড়ির দুই বয়স্কা মহিলার সঙ্গে কথা হলো। তাঁরা বললেন: রোজই তো গাড়ি করে লোক ধরে আনছে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মহিলা আর শিশুই বেশি, সব মুসলমান, শোনা যাচ্ছে এদের নাকি বসিরহাট থেকে আনছে, আমরা কারো সঙ্গে তো কোনো কথাবার্তা বলতে পারি না, যাদের ধরে আনছে তাদের সঙ্গে না, পুলিশদের সঙ্গেও না, তারপর রোজই গাড়ি করে এখান থেকে লোকজনকে নিয়ে আবার কোথায় চলেও যাচ্ছে কে জানে, প্রথম দিনে তো খান-পঁচিশ জনকে ধরে এনেছিল, এখন এই রোজ আনা-নেওয়ার মধ্যে কজন ঠিক আছে কে জানে... দেখে খুব কষ্ট হয়... কিন্তু কী করার আছে?

হ্যাঁ, পাঠক, আমিও জানি না কী করার আছে। এটুকু জানি যে এ সহ্য করা যায় না। তাই উপছে-ওঠা অস্থিরতা নিয়ে আপনাকে পড়ানোর জন্য এ লেখাটা লিখে ফেললাম। যদি পড়েন। যদি ভাবেন। তাহলে একা নয়, একসঙ্গে ভাবা যাবে সত্যিই কি কিছু করার নেই?

[বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে দেখার সময় আমার সঙ্গীরা ছিল: অর্ঘ্যদীপ, কাশ্যপেয়, অনিরুদ্ধ, সুশোভন, এই লেখার পিছনের ভাবনাচিন্তা আমাদের সবার আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই গড়ে উঠেছে। বাঙ্গিটোলার খিদির বক্স ও তরিকুল ইসলাম এবং মালদা টাউনের গৌতম চৌধুরী ও গৌতম পাল তাঁদের নানা ভাবনা-চিন্তা-পর্যবেক্ষণ বিনিময় করে আমাদের সাহায্য করেছেন।]

২৬ জুন, ২০২৬

কর্তিত বাংলা ও ২০ জুনের মহোৎসব

সজল রায়চৌধুরী

২০ জুন ১৯৪৭। বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভার ভোটাভুটির ফল। এর একটা বয়ান হল, তারিখটা বাঙালি হিন্দুদের জীবনে অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ওইদিন আইনসভায় ভোটাধিক্যে বাংলাভাগের প্রস্তাব পাশ হয়েছে। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ও মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গে। এ বিষয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রধান ভূমিকা নেন। এজন্য তাঁকে পশ্চিমবঙ্গের জনক আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি এই উদ্যোগ না নিলে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা পাকিস্তানের পেটে চলে যেতেন। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পরে এই দিনটিকে তাই পশ্চিমবঙ্গ দিবস ও শ্যামাপ্রসাদকে এই রাজ্যের জনক হিসাবে পালন করা শুরু হয়েছে।

এই বয়ানটি ইতিহাসের আলোয় বিচার করাই এ নিবন্ধের লক্ষ্য। কয়েকটা তথ্য এ প্রসঙ্গে জেনে রাখা দরকার, না হলে ভুল ধারণা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আইনসভা বললেই আমাদের মনে আসে আজকের সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আইন প্রণয়ন সংস্থার কথা। ১৯৪৬ সালে গঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক ব্যাবস্থাপকসভা তেমনটি ছিল না। কীরকম ছিল? সাম্প্রদায়িক ও পেশাভিত্তিক। একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক। আসন বিভাজন ছিল সাম্প্রদায়িক ও পেশাভিত্তিক/করদানভিত্তিক। ২০ বছরের ওপরের নাগরিকদের মধ্যে কাদের ভোটাধিকার ছিল?

কর ভিত্তিক

১. আয়কর দাতা;
২. মোটরযান করদাতা;
৩. কর্পোরেশন ট্যাক্স ও লাইসেন্স প্রাপ্ত

সম্পত্তিভিত্তিক

১. চাকরি সূত্রে কলকাতায় বসবাসকারী যারা বছরে ৪২ টাকার বেশি বাড়িভাড়া দেন।
২. জমি, বাড়ির বার্ষিক ভাড়া প্রাপক।

শিক্ষাভিত্তিক

১. ম্যাট্রিক বা সমমানের পরীক্ষা পাশ
২. মিডল স্কুল ফাইনাল পাশ

সামরিক চাকরিভিত্তিক

১. নিয়মিত ফৌজের রেগুলার বা অবসরপ্রাপ্ত অফিসার, জুনিয়র কমিশনড অফিসার।

মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত শর্ত

১. সেনাবাহিনীর পেনশনপ্রাপ্ত সৈনিকদের বিধবা/মা।
২. স্বামী যদি যোগ্য হন।
৩. স্বাক্ষর হলে।

১৯৪৬ সালে মোট জনসংখ্যার ১৩ শতাংশ মানুষের ভোট ছিল। সমাজের ওপরের ও শিক্ষিত মধ্যস্তরের বাইরে কারো ভোটাধিকার ছিল না।

নির্বাচন ক্ষেত্রের দিকে তাকালেও আমরা আজকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা চিত্র দেখতে পাই।

১. সাধারণ আসন
   ক. মূলত হিন্দু ভোটারদের জন্য ৭৮টি আসন
   খ. মূলত মুসলিম ভোটারদের জন্য ১১৭টি আসন। এদের মধ্যে ৬টি শহুরে আসন ও ১১১টি গ্রামীণ আসন।
২. ইউরোপীয় নির্বাচনী আসন ১১টি
৩. অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আসন ৩টি

৪. ইন্ডিয়ান ক্রিশ্চান আসন ২টি

৫. বাণিজ্য, শিল্প ও বাগান আসন ১৯টি
এদের মধ্যে আছে কলকাতা ও চট্টগ্রাম বন্দর, বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স, পাট-স্বার্থ, চা-স্বার্থ, রেল ব্যবসা।

৬. জমিদার আসন ৫টি

৭. শ্রমিক প্রতিনিধি ৮টি

৮. শিক্ষা আসন ২টি [কলকাতা-১ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-১]

৯. মহিলা আসন ৫টি [সাধারণ ২, মুসলিম ২, অ্যাংলো ১]

মোট আসন সংখ্যা ২৫০

এক নজরেই বোঝা যায় যে এই আইনসভায় পুঁজিপতি, জমিদার, ব্রিটিশ স্বার্থ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের শিক্ষিত মানুষদের কণ্ঠস্বরই পাওয়া সম্ভব। শ্রমিকস্বার্থের প্রতিনিধি যৎসামান্য থাকলেও বিপুল পরিমাণ বাঙালি হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের প্রতিনিধিত্বের সুযোগ ছিল না। সুতরাং এই ভোটকে গণভোট একেবারেই বলা চলে না। কিন্তু বিদ্যা ও বিত্তে ক্ষমতাবানদের বাইরের মানুষের অসাম্প্রদায়িক কণ্ঠস্বর কি তখন কোনোভাবেই শোনা যায়নি? হ্যাঁ, গিয়েছে। ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে অনাহারে যাঁদের প্রাণ গেছে, তাঁদের সাথীরা ১৯৪৬ সালেই হিন্দু-মুসলিম আদিবাসী মিলিতভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে তেভাগা আন্দোলনে শামিল হন। ১৯৪৬-এর ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের যোদ্ধা রশিদ আলির মুক্তির দাবিতে গোটা বাংলা উত্তাল হয়ে ওঠে। ওপর মহলেও শরৎ বসু ও আবুল হাশিম অবিভক্ত ভারতের সঙ্গে নিখিল ফেডারেশনে যুক্ত অবিভক্ত বাংলার দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশ্বাসের সেতুটা ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্টের ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে ও পরবর্তী ভয়ঙ্কর দাঙ্গায় অনেকটাই ভেঙে গেল। দুই সম্প্রদায় একসাথে থাকতে পারবে না এই ধারণা চেপে বসতে থাকল। এরকম একটি আবহাওয়ায় এল ২০ জুন ১৯৪৭।

এবার আমরা ইতিহাসের রাস্তা বেয়ে একটু পিছিয়ে যাই। কীভাবে বিষবৃক্ষ বীজ থেকে বিবর্তিত হয়ে এখানে এসে পৌঁছাল। এই চলনের পথে দেখব ২০ জুন ১৯৪৭-এর বঙ্গীয় আইনসভার ভোট কি আদৌ দেশভাগের ক্ষেত্রে নির্ধারক অবস্থানে ছিল।

শুরু করা যাক সাইমন কমিশনের ভারতে আগমন থেকে। উপনিবেশিক শাসকরা পরাধীন ভারতের হাতে ছিটেফোঁটা অধিকার দেওয়ার জন্য শাসন সংস্কার শুরু করেছিল। সেই সূত্রে শুধুমাত্র ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সাইমন কমিশন ভারতে আসে। কিন্তু ভারতের যেখানেই তাঁরা যাচ্ছিলেন সেখানেই 'সাইমন ফিরে যাও' শুনতে হয়েছিল। সালটা ছিল ১৯২৮। সাইমন ফিরে গেল। কংগ্রেস ও লীগ ভাবতে শুরু করল যদি ভারতীয়দের হাতে আরো কিছুটা ক্ষমতা দাবি করতে হয় তার রূপরেখা ঠিক করা দরকার। মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ও জওহরলাল নেহরুকে সম্পাদক করে নেহরু কমিটি তৈরি হল ১৯২৮-এ। প্রস্তাব তৈরি ও কংগ্রেস দলে সেটা গৃহীতও হল।

নেহরু প্রস্তাব:

১. পূর্ণ ডোমিনিয়ন স্টেটাস: ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকবে কিন্তু পুরো শাসনভার চাই।
২. ভারত হবে ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্র।
কেন্দ্র শক্তিশালী হবে। প্রদেশগুলোর ক্ষমতা অল্প থাকবে। ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা নির্বাচন হবে না।
৩. মৌলিক অধিকার, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমতা থাকবে।
৪. মুসলিমদের জন্য আলাদা সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সংস্কার। কেন্দ্র ও প্রদেশে মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণ। কিন্তু আলাদা নির্বাচন নয়।

জিন্নার চোদ্দ দফা প্রস্তাব:

এই প্রস্তাব নেহরু প্রস্তাবের জবাবে রাখা হয়। সময় ১৯২৯ সাল। প্রস্তাবের প্রথম ১৩টি প্রস্তাব মুসলিমদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ১৪ নম্বর প্রস্তাবটি।

প্রস্তাবে বলা হয়:

দফা ১৪: ভারতের বিভাজন

'যদি ভারত ভাগ হয়, তাহলে সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে একসাথে করে আলাদা রাজ্য করতে হবে।'

এই প্রস্তাবেই ১৯৪০ সালের পাকিস্তান প্রস্তাব ও ১৯৪৭ সালের বিভাজিত ভারতের মানচিত্রের ইঙ্গিত পাই। যদিও স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি এখনও রাজনীতিতে আসেন।

'বাংলার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের' মধ্যে আমরা বাংলাভাগের অশনি সঙ্কেত পাচ্ছি।

ইতিহাসের ধারায় দেখলে আমরা পাই ১৯৩১-৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনে সারা ভারত 'উথাল পাথাল' হওয়া। ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নানা পক্ষ আত্মপ্রকাশ করেছে। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ছাড়াও দলিত নেতা আম্বেদকর, কমিউনিস্ট ও হিন্দুত্ববাদী আরএসএস (ঘোষিত অর্থে রাজনৈতিক দল নয়) এবং হিন্দুমহাসভা। কংগ্রেস ছিল একটা প্ল্যাটফর্ম। কংগ্রেসে থেকেও একই সঙ্গে অন্য দলের সদস্য হওয়া যেত। মোটকথা ভারতীয়দের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতি আনুগত্য অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭-এ যখন প্রাদেশিক নির্বাচন হয় এখন পার্টিতন্ত্র গড়ে ওঠে। গান্ধীজি কংগ্রেসের এই ভোটপার্টি হয়ে যাওয়ার কারণে কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেন। আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা না থাকলেও তাঁর নৈতিক কর্তৃত্ব ছিল অবিসংবাদী।

১৯৩৭-এর ভোটে কংগ্রেস ৮টি প্রদেশে জয়লাভ করে। লীগের ফলাফল শোচনীয়। মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৪৪২টি আসনের মধ্যে লীগ জিতল মাত্র ১০৯টি আসনে। পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাংলায় লীগ হেরে গেল। পাঞ্জাবে জিতল ইউনিয়নিস্ট পার্টি, সিন্ধুতে স্থানীয় দল আর বাংলায় কৃষক প্রজাপার্টি লীগের মিলিত সরকার। লীগ সেখানে সংখ্যালঘু।

এই ধাক্কার পর লীগ কংগ্রেসি অত্যাচারের কথা তোলে। কংগ্রেস হিন্দুদের দল, মুসলিম ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি লীগ, এই বয়ান সজোরে সামনে আনে।

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় এবং ভারতকে এই যুদ্ধে জড়িয়ে নেওয়া হয়। ২২ ডিসেম্বর জিন্না কংগ্রেসমুক্ত প্রদেশগুলির মুক্তি দিবস ঘোষণা করলেন।

এই সময়ে হিন্দু জাতিতত্ত্বের গেরুয়া পতাকা তুলে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এক তাত্ত্বিক বয়ান প্রচার করে। সংঘ প্রধান গোলওয়ালকর লিখেছেন,

'হিন্দুস্তানে থাকবে প্রাচীন হিন্দুজাতি এবং হিন্দু জাতি ছাড়া আর কেউ নয়। আর যাঁরা হিন্দু জাতির ধর্ম, সংস্কৃতি ও ভাষার মধ্যে পড়েন না তাঁরা স্বাভাবিকভাবে জাতীয় জীবনের গণ্ডির বাইরে থাকবেন।'

এই প্রসঙ্গে হিটলারের আর্য গরিমাবাদের উচ্চ প্রশংসা করেন,

'জার্মান জাতিগরিমা আজ সবার কাছে আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছে। জাতির ও সংস্কৃতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য জার্মানি তাদের দেশ থেকে সেমিটিক জাতির ইহুদিদের বিতাড়ন করে বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। জাতীয় গরিমায় সর্বোৎকৃষ্টতা এখানে প্রকাশিত হয়েছে।... হিন্দুস্তানে আমাদের কাছে তা এক ভালো শিক্ষা যা আমাদের শিখতে হবে'। [We or our Nationhood defined]

কয়েকমাস পরেই ১৯৪০-এর মার্চ মাসে মুসলিম লীগের লাহোর কংগ্রেসে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দুজাতিতত্ত্ব ও মুসলিম জাতিতত্ত্ব পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। কংগ্রেসের মধ্যে নানা রঙের মতাদর্শ থাকলেও গান্ধীজির অসাম্প্রদায়িক নৈতিক কর্তৃত্ব তখনও অম্লান ছিল। বিভেদ বিভাজনের ঊর্ধ্বে ব্রিটিশমুক্ত স্বাধীন ভারতের জন্যই তাঁর একান্ত আগ্রহ ছিল। তিনি জানান ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয়রা সহায়তা করবে কিন্তু দেশকে স্বাধীনতা দিলেই সেটা সম্ভব। এটাই ছিল ১৯৪২-এর আগে কংগ্রেসের অবস্থান। সর্বভারতীয় কমিটির সভায় এই মর্মে প্রস্তাব নেওয়া হয়। গান্ধীজি 'হরিজন' পত্রিকায় লেখেন, 'আমি নিশ্চিতভাবেই বুঝেছি যুদ্ধের পরে নয়, যুদ্ধের মধ্যেই ব্রিটিশকে ভারতের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে হবে। সৌভ্রাত্রের সম্পর্ক রেখেই ব্রিটিশ ভারত ছেড়ে চলে যাক, সেটাই হবে সবার পক্ষে হিতকর।' [হরিজন, ১০ মে ১৯৪২]

লুই ফিশার জানাচ্ছেন, ১৭ মে গান্ধীজি হরিজন পত্রিকায় বললেন ব্রিটেনের জনগণকে ভারতের স্বাধীনতাকে সমর্থন জানাতে। [The Life of Mahatma Gandhi, লুই ফিশার, অধ্যায় ২২]

চার্চিল ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেসের যে কেনো আন্দোলন দমনপীড়নের সাহায্যে স্তব্ধ করার নীতি নিলেন। যুদ্ধের মধ্যেই ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার আন্তর্জাতিক চাপ রুজভেল্ট ও চিয়াং কাইশেকের তরফে ব্রিটিশের ওপর ছিল। কারণ এই সময় মিত্রশক্তি যুদ্ধে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ছিল। রুজভেল্ট মারফত চিয়াং কাইশেকের টেলিগ্রাম পেলেন চার্চিল। তাঁর উত্তর—

'কংগ্রেস দল কোনোভাবেই ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে না। ৯ কোটি মুসলমান, ৪ কোটি হরিজন আর করদ রাজ্যের ৯ কোটি লোক ওদের বিরুদ্ধে। ওরা শুধু অ-যোদ্ধা হিন্দুদের প্রতিনিধি।

'ক্রিপস মিশনের বাইরে আর কোনো প্রস্তাব আমাদের দেবার নেই।' [The Transfer of power, উদ্ধৃতাংশটি দেবচন্দ্র ঝা অনুবাদ করেছেন।]

এই সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের পটভূমি। জাতীয় কংগ্রেস এবিষয়ে পথরেখা ঠিক করার জন্য বোম্বাইয়ে সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই ৯ আগস্ট গান্ধীজি সহ সব নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই সময় গান্ধীজি 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ডাক দেন। এই আন্দোলনে গোটা ভারত উত্তাল হয়ে ওঠে। মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকার গঠন-সহ সারা ভারতে স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণ ঘটে। বাংলার জনগণ মুখ্যস্থান দখল করে।* এই জাগরণের সময় লীগ বা হিন্দু মহাসভার ভূমিকা ছিল আন্দোলন বিরোধী। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও জনযুদ্ধের নামে আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে। এই সময়ের চিত্র আন্দোলন বিরোধীদের কলমেও ফুটে উঠেছে। বাংলায় হিন্দু মহাসভার এক নেতা এন সি চ্যাটার্জি আর এস মুনজেকে ১৪ আগস্ট ১৯৪২-এ এক চিঠিতে লিখছেন,

> 'বাংলার বর্তমান পরিস্থিতি এরকম। হিন্দু সম্প্রদায়ের পুরোটা গান্ধী ও তাঁর আন্দোলনের সঙ্গে আছে। কেউ যদি বিরোধিতা করতে চায় তার সর্বনাশ হয়ে যাবে এবং জনপরিসর থেকে তাকে তাড়া করে বের করে দেওয়া (hounded out) হবে। তা ছাড়া 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের বিরুদ্ধে বীর সাভারকর যে দুর্ভাগ্যজনক বিবৃতি দিয়েছেন তাতে বাংলায় আমাদের দশা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।
>
> মজার ব্যাপার হল জিন্না সাহেব মুসলমানদের বারণ করছেন এই কংগ্রেসি আন্দোলনে যোগ দিতে। শ্রী সাভারকর চান হিন্দুরা যেন এই আন্দোলনে যোগ না দেয়। তবুও কংগ্রেসের এই আন্দোলন বিরাট উদ্বেলতা জাগিয়েছে এবং হাজার হাজার অনুসারী তাতে যোগ দিয়েছে।'
>
> [রামচন্দ্র গুহ, Gandhi: The Years that changed the World, p. 685]

---

* এই প্রসঙ্গে আমার [বর্তমান লেখকের] শৈশবের একটা স্মৃতি মনে পড়ছে। ১৯৪৫ সালে দিদিদের গাইতে শুনেছি—'করব কিম্বা মরব' মন্ত্রে জাগল সারা দেশ মরা মায়ের অঙ্গে দেখো সুমধুর বেশ।

এই জন পরিত্যক্ত হিন্দু মহাসভার নেতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। এই সময় তিনি আন্দোলন দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে কাতর আবেদন করেন। এরপর দুর্ভিক্ষ শুরু হতেই 'আমার কেনো দায় নেই' বলে সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। ব্রিটিশ সরকারের ডিনিয়াল পলিসি ও বাংলা সরকারের অপদার্থতায় ৩৫ লক্ষ বাংলার মানুষ অনাহারে প্রাণ হারান। তারা হিন্দুও না মুসলমানও নয়, শুধু মৃতদেহ। বলা বাহুল্য, অধিকাংশই গ্রামের গরিব।

১৯৪৫-এ যুদ্ধ শেষ হল। দেশ স্বাধীন হবে। ব্রিটিশরা ঠিক করেছে ১৯৪৮-এর জুন মাসের মধ্যেই কার হাতে ভারতকে দিয়ে যাবে সেটা ঠিক করতে হবে।

ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তর্বর্তী কাজ করার তাগিদে কংগ্রেস-লীগ অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হল। প্রথমে একটি পরে দুটি সংবিধান পরিষদ তৈরি হল।

গান্ধীজি ক্রিপস, ওয়াভেলকে যা বলেছিলেন মাউন্ট ব্যাটেনকেও সে প্রস্তাবই দিলেন, 'যদি অরাজকতার মধ্যে দেশকে ছেড়ে যেতে না চান তবে কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ, যে কোনো একটি রাজনৈতিক দলের হাতে গোটা দেশের শাসনভার দিয়ে যান।' [মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস ও দেশভাগ, দেবচন্দ্র ঝা, পৃ. ৬৬]

ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে দেশভাগ যাতে না হয় সেজন্য গান্ধী একটা খসড়া সমাধান বড়লাটকে দিয়েছিলেন। সেগুলো এরকম:

১. সরকার গঠনের ভার জিন্না যদি চান তাঁকেই দেওয়া হোক।
২. ক্যাবিনেট সদস্যদের নাম চূড়ান্ত করার দায়িত্বও তাঁকেই দেওয়া হোক।
৩. জিন্না যদি এতে রাজি থাকেন, তবে কংগ্রেস সবরকমভাবে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সিদ্ধান্ত ভারতের স্বার্থের পরিপন্থী না হয়।
৪. ভারতের সামগ্রিক স্বার্থে কাজ হচ্ছে কিনা তার বিবেচনার ভার ব্যক্তিগতভাবে মাউন্ট ব্যাটেনের হাতে থাকবে।
৫. ক্যাবিনেটে মুসলিম লীগ বা অন্য সহযোগীদের হয়ে জিন্নাকে আশ্বাস দিতে হবে যে তাঁরা সমগ্রভারতে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবেন।
৬. ন্যাশনাল গার্ডবা অন্য কোনো ধরনের বে-সরকারি সেনাদল রাখা যাবে না।
৭. উপরোক্ত কাঠামোর মধ্যে থেকে জিন্না যদি চান, তাঁর পাকিস্তান প্রস্তাব ক্যাবিনেটের অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের

আগেই। অবশ্য তাঁকে শক্তির সাহায্যে নয়, যুক্তির সাহায্যে, কোনোরকম চাপ সৃষ্টি না করে সমস্ত প্রদেশের অনুমোদন নিতে হবে।

৮. প্রাদেশিক বিধানসভাগুলিতে কংগ্রেসের গরিষ্ঠতা থাকলেও লীগের প্রস্তাব বিবেচনার সময় সেই গরিষ্ঠতার সুযোগ না নিয়ে দেশের স্বার্থের কথা খোলা মনে বিচার করবে। আর দেশের স্বার্থের কথা বিবেচনা করবেন মাউন্ট ব্যাটেন।

৯. জিন্না যদি এই দায় নিতে অস্বীকার করেন তবে উপযুক্ত রদবদল করে সেই দায়িত্ব দেওয়া হোক।

ভারতকে অবিভক্ত রাখার এই প্রস্তাব কংগ্রেসের নেতারা মেনে নিতে পারলেন না। একটি কারণ, ইতিমধ্যেই কংগ্রেস-লীগ অন্তর্বর্তী মন্ত্রীসভায় একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে কংগ্রেস ও লীগের মন্ত্রীদের অবিরাম ঠোকাঠুকি লাগছিল। ক্ষমতার স্বাদ তাঁদের রক্তে দোলা দিয়েছিল। 'নিঃসপত্ন রাজ্যমাঝে রত্ন সিংহাসনে' বসার আগ্রহ তীব্র হয়ে উঠেছিল। একসঙ্গে কংগ্রেস ও লীগ মিলে আগামী ভারতে বসা তাঁদের কাছে ক্রমশ বেশি বেশি করে অসহনীয় মনে হচ্ছিল।

নেহরু গান্ধীজিকে বললেন, 'এই প্ল্যানে অনেক গলদ আছে, তাই আমার পক্ষে একে সমর্থন করা সম্ভব নয়।' [জে বি কৃপালনী, Gandhi, His life and Thought, p. 280]

গান্ধীজি মাউন্টব্যাটেনকে লিখলেন, 'নেহরুর সঙ্গে কয়েকবার স্বল্পক্ষণের জন্য এবং একবার এক ঘণ্টাব্যাপী একান্তে আলোচনা হয়েছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে আমার প্ল্যানের খসড়া নিয়েও বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমি তাঁদের হৃদয়ে বা মস্তিষ্কে আমার যুক্তির যথার্থতা পৌঁছে দিতে পারিনি। তারাও আমার নিজস্ব মত থেকে আমাকে টলাতে পারেনি। যদিও আমি এখনও সব কিছু খোলা মন নিয়ে বিচার করতে রাজি, তবুও আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে আর এব্যাপার নিয়ে জড়াবেন না।' [Pyarelal, The Last Phase, vol. 2, chap.4]

তবুও জড়িয়ে থাকতে হল গান্ধী জিন্নাকে একটা চিঠি লিখলেন, তাতে তিনি পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাংলার মানুষের মতামত জানা উচিত বলে মনে করালেন। তারা ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দিতে চায় না স্বাধীনভাবে নিজেদের অখণ্ডতা বজায় রাখতে ইচ্ছুক। [2.6.47 ও 17.6.47-এর চিঠি, Pyarelal Ibid]

কিন্তু দেখা গেল নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী পাঞ্জাব বিভাজন ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাকভুক্তির পক্ষে আগেই সম্মতি দিয়ে এসেছেন।

শেষে ঠিক হল বাংলা এবং সীমান্ত প্রদেশে স্বাধীনতার জন্য গণভোট তখনই করা হবে, যখন কংগ্রেস ও লীগ উভয়েই তাতে রাজি থাকবে। দেখা গেল কংগ্রেস বিশেষত নেহরু ও প্যাটেল সীমান্ত প্রদেশে গণভোট করাতে রাজি। বাংলায় নয়। আবার জিন্নার দাবি যদি গণভোট করতেই হয় তবে বাংলায় আগে।

অবশেষে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের খানভাইরা গণভোট বয়কট করে পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির পথ খুলে দিলেন। স্বাধীন বাংলার জন্য গণভোট হাওয়ায় উড়ে গেল। ভারতভাগ তথা বঙ্গ বিভাজন কেন্দ্রে বসেই fait accompli বা নির্ধারিত ঘটনায় পরিণত হল।

অখণ্ড ভারতের বয়ান থেকে কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীকে অগ্রাহ্য করেই কেন বিভাজনের পক্ষে মত দিলেন?

১৯৫৬ সালে নেহরু তাঁর জীবনীকার মাইকেল ব্রেকারের কাছে অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন।

> 'প্রকৃত ঘটনা হল এই যে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর আমাদের বয়সও বাড়ছিল। আমাদের মধ্যে খুব কম লোকই দেশভাগের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আবার জেলে যেতে প্রস্তুত ছিলেন। দেশভাগের প্রস্তাব হাতে পেয়ে আমরা যেন বেঁচে গেলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে তা গ্রহণ করলাম।' [সূত্রঃ পূর্বোক্ত দেবচন্দ্র ঝা, পৃ. ৭৬]

সুতরাং ভারতভাগের সঙ্গে বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত আগেই হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস, লীগ ও ব্রিটিশের চতুর বৈঠকগুলোতে। ২০ জুন বাংলার আইনসভায় শুধু তাতে শিলমোহর পড়ল। এখানে ভোটাভুটি হওয়ার আগেই ফলাফল সবার জানা ছিল। হিন্দু মহাসভা বা শ্যামাপ্রসাদের ভূমিকা দেখতে হলে দূরবীন লাগে। বাংলাভাগের এই শোকাবহ ঘটনার পেছনে দাঙ্গার রক্তস্রোত আর সামনে দেড় কোটি ভিটেমাটি ছাড়া মানুষের চোখের জল। মাঝখানে দাঁড়িয়ে কীসের জন্মোৎসব!!

বাংলা ভাগের কলঙ্ক? নাকি, কৃতিত্ব? কারা কোনটার কেন দাবিদার?

সমীর কর্মকার

'কোমল গান্ধার'-এর অনুসূয়া ও ভৃগু (ঋত্বিক ঘটক, ১৯৬১)

ব্রিটিশ শাসিত ভারতের ক্ষমতার হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে যে কর্তৃত্বের বণ্টন তার ফলে তৈরি হয়েছিল প্রজাতান্ত্রিক ভারত ও ইস্লামীয় প্রজাতান্ত্রিক পাকিস্তান। ব্রিটিশ ভারতের পাঞ্জাব ও বাংলাকে আড়াআড়ি ভাবে কেটে এমন দুইটি রাষ্ট্রের যুযুধান বাস্তবতা তৈরি হলো, যা জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নটিকেই চিরকালের জন্য মুলতুবি করে দিলো। যদিও আমাদের এই আলোচনা মূলত বাংলার

বিভাজনকে নিয়ে, তবুও এমন কিছু প্রসঙ্গ আছে যাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বাদ দিয়ে আজকের খণ্ডিত বাঙালি যাপনের তাৎপর্য বোঝা অসম্ভব।

(ক)

প্রশাসনিক সুবিধার অজুহাতে তৎকালীন ব্রিটিশরাজের ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দুইটি টুকরো ভেঙে ফেলার যে পরিকল্পনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল ডিভাইড অ্যান্ড রুলের ঘৃণ্য চক্রান্ত। মুসলিম অধ্যুষিত পূর্ব বঙ্গ এবং আসাম বনাম হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক এই প্রকল্প ছিল ধর্মভিত্তিক বিভাজনের নিকৃষ্টতম নিদর্শন। এই প্রসঙ্গে, ১৯০৫-এর ৮ই অগাস্ট ইউকে পার্লামেন্টের হাউস অফ কমন্সের হারবার্ট রবার্টসের প্রশ্নের উত্তরে ব্রোড্রিকের নিচের উত্তরটি লক্ষণীয়:

> The territories to be transferred from Bengal to the new province consist of the districts of the Chittagong and Dacca Divisions, those of the Rajshahi Division except Darjeeling, and the district of Malda. The line of demarcation will follow the present boundaries of those districts. The new province, which will be a Lieutenant-Governorship, will be called "Eastern Bengal and Assam."

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো, এই কথোপকথনের বাকি অংশটুকু যদি উৎসাহী পাঠক Proposed Partition Of Bengal Volume 151: debated on Tuesday 8 August 1905 শীর্ষক নথিতে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন জাতি রাষ্ট্রের কাঠামোয় টেরিটোরিয়াল কনস্টিচুয়েন্সিস বারংবার নির্ধারণের যে প্রক্রিয়াকে সাম্প্রতিক রাজনীতিতে ডিলিমিটেসন নামে দাগানো হয়েছে তার মান্যতা ঐতিহাসিকভাবে নিহিত রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের বিধি ব্যবস্থায়। বুঝতে হবে পুনর্বিন্যাসের এই সকল ধরনের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকে আদমশুমারি এবং ভোটকেন্দ্রিক বিভিন্ন ধরনের বিধি বন্দোবস্ত। এ প্রসঙ্গে সময় সুযোগ মতো এই আলোচনায় আলোকপাত করা যাবে।

১৯০৫ সালে ব্রিটিশদের এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে সরব হন বাংলার মানুষ। বঙ্গভঙ্গ রোধের এই আন্দোলনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে সোচ্চার হন বিশিষ্টজনেরাও। কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়, বাংলার মাটি, বাংলার মানুষের শুভকামনা। ব্যর্থ হয় বৃটিশরাজের ঘৃণ্য প্রশাসনিক চক্রান্ত। রাষ্ট্রের এই পিছু

হটা ছিল সাময়িক। সরাসরি বঙ্গভঙ্গের কথা না বললেও আদমশুমারি, নির্বাচন ব্যবস্থার পরিকল্পনার মতো বিভিন্ন প্রশাসনিক উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে বঙ্গভঙ্গের জমি তৈরির লক্ষ্যে বৃটিশরাজ একদিনের জন্যেও নিশ্চেষ্ট ছিল বলে মনে হয় না। ১৯০৯ সালে তৎকালীন ভারতের সেক্রেটারি অব স্টেট জন মর্লি এবং ভাইসরয় লর্ড মিন্টো-র নামানুসারে মর্লে-মিন্টো সংস্কার (বা ১৯০৯ সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন) সেই ধরনেরই এক সচেষ্টতার নিদর্শন। এই সংস্কারের মাধ্যমে ভারতে প্রথমবার সীমিত আকারে নির্বাচনের প্রবর্তন করা হয় এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর অধিকার দেওয়া হয়—যা ক্ষমতায়নের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণতান্ত্রিক মনে হলেও আদপে ছিল ভাগাভাগির রাজনীতিকে তোল্লাই দেওয়ার সরকারি পদক্ষেপ। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে সদস্য সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়। ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদে এবং সেক্রেটারি অব স্টেট-এর কাউন্সিলে ভারতীয়দের নিয়োগের পথ উন্মুক্ত করা হয়। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোতে সরকারি কর্মকর্তাদের সংখ্যা কমিয়ে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়া হয়। এই সকল আপাত নিরপেক্ষ প্রশাসনিক সংস্কার যতই গণতান্ত্রিক মনে হোক না কেন, আসলে ছিল সাধারণ মানুষবিরোধী, সাম্প্রদায়িক ভাবে উস্কানিমূলক এক নিরঙ্কুশ আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপনের উদ্যোগ।

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন (যা মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার নামেও পরিচিত) মোতাবেক যেমন দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ঠিক একইরকম ভাবে ১৯০৯ সালের আইনের ধারাবাহিকতায় শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এবং ইউরোপীয়দের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৩০-এ সাইমন কমিশনের একটা অন্যতম সুপারিশ ছিল—নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ও বিশেষ স্বার্থভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব অব্যাহত রাখার সুপারিশ। ফলত, পরবর্তী সময়ে ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে আরও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের একটা ছোট অংশ মহম্মদ শফির নেতৃত্বে সাইমন কমিশনের সমর্থন করলেও, মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিমদের বিরোধ উল্লেখনীয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলি সেদিন সাইমন কমিশনের বয়কট আন্দোলনে যোগদান করেছিল। এই সকল রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে ১৯৩৫

সালে, প্রাদেশিক সার্বভৌমত্বের দিকনির্দেশ করে ফেডারেল স্ট্রাকচারের ভিত্তি স্থাপনে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এইরকমই বহু প্রশাসনিক অদল বদলের মধ্যে দিয়ে আমরা উপনীত হই, ১৯৪৭-এর ২০শে জুনের বাংলা ভাগের ঐতিহাসিক নথিটিতে।

মনে রাখতে হবে ১৯৪৭-এর ২০শে জুন বাংলাকে ভেঙে দুই টুকরো করার প্রক্রিয়াটি আদৌ গৌরবের নয়। বরং, লজ্জার। ব্রিটিশ হুকুমতের যে ডিভাইড অ্যান্ড রুলের অভিসন্ধিকে ১৯০৫-এ আটকে দেওয়া গিয়েছিল, সেই অভিসন্ধি ঔপনিবেশিক চক্রান্তে ধর্মীয় পরিচিতির উন্মাদনাকে হাতিয়ার করে বাংলা ভাগের পথকেই বাস্তব করে তুলেছিল সাতচল্লিশের বিশে জুন। ইতিহাসের এই কালো অধ্যায়ের জন্য কেবল যে ব্রিটিশরা দায়ী ছিলেন তেমন নয়, ছিলেন দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, বিদেশ থেকে ওকালতি পড়ে দেশীয় রাজনীতিতে যোগদানকারী একটি বড় সংখ্যক ভারতীয় উকিল, শিক্ষাবিদ, সমীক্ষক, সংস্কারক-সহ আরও অনেকে। এঁদের যৌথ উদ্যোগে আপামর বাঙালির জীবনে স্বাধীনতার রঙিন ছবি দেখিয়ে এক অন্তহীন বিদ্বেষের বিষ জাতি রাষ্ট্রের রাজনীতির মধ্যে দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বাংলা ভাগের পিছনে প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান চর্চা সেদিন কিভাবে কার্যকর ছিল, সে নিয়ে বিশদে আলোচনার অবকাশ এখানে না থাকলেও, একটি উদাহরণ দেওয়া উচিত বলে মনে হয়। একটা গোষ্ঠীকে জাতিসত্ত্বার অজুহাতে বহু টুকরোয় ভেঙে দেওয়ার পিছনে যে শাসন এবং শোষণের তন্ত্রগুলি সদা সক্রিয় থাকে তার একটা ধারণা এখানে থাকাটা একান্ত ভাবেই জরুরি। দুটি কাজ উদাহরণ হিসেবে এখানে পেশ করবো। প্রথম কাজটি জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসনের লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, এবং দ্বিতীয়টি সুনীতিকুমার চ্যাটার্জির অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ। সর্বভারতীয় ভাষা সমীক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি যখন ভারতীয় জাতি রাষ্ট্রের চৌহদ্দির মধ্যে ভাষাভিত্তিক ছোট বড় শতাধিক জাতি সত্তার নির্মাণ এবং বিনির্মাণের আঁতুড় ঘর হয়ে উঠেছিল, দ্বিতীয় কাজটি তখন বাংলার মিশ্র ভাষা সংস্কৃতির আলোচনায় "মুসলমানী বাংলা"র ইতিহাস ও ভূগোল আলোচনা করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই মান্যতা দিয়ে বসছে মুসলমান বনাম অমুসলমানের দ্বিত্বতাকে। বিদ্যায়তনিক পরিসরের এই সকল চর্চা যেন কোনো একভাবে দ্বিখণ্ডনের ভিত্তিভূমি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। যেন বা ১৯৪৭-এর ২০শে জুনের জ্ঞানতাত্ত্বিক বৈধতা নিরূপণ করে দেয়।

ঔপনিবেশিক পর্বের এই রকম অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে জ্ঞান চর্চার বিভিন্ন ধারায়। ভাবতে অবাক লাগে, যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার, মেঘনাদ সাহার মতো যে ব্যক্তিত্বরা ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ভাবাদর্শকে তুলে ধরেন, তাঁরাই আবার ১৯৪৭-এ এসে দ্বিখণ্ডনের পক্ষে দাঁড়ান! ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭-এর এই যাত্রাপথে এমন কি ঘটেছিল সেদিন যার জন্য সমন্বয়কে সরিয়ে অসহিষ্ণুতা পাকাপাকি ভাবে জাঁকিয়ে বসেছে? এর উত্তর সেই পর্বের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বিদ্যায়তনিক সংস্কারের অনুপুঙ্খ আলোচনা করে কেউ হয়তো বলবেন কোন একদিন।

১৮৬৫ সালের দেওয়ানি লাভের পর ব্রিটিশরা বাংলার রাজস্ব নীতি ও অর্থনৈতিক প্রশাসনিক সংস্কারকে কেন্দ্র করে বঙ্গভঙ্গর সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা করেছিল। এটি শুধু প্রশাসনিক বিভাজন ছিল না, বরং অনুন্নত অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দোহাই পেড়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার সুদূরপ্রসারী কৌশল।

ভূমি ব্যবস্থার সংস্কার এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (Permanent Settlement) সুদূরপ্রসারী অর্থনৈতিক প্রভাবকে উপেক্ষা করে বাংলার ভবিতব্যকে বোঝা অসম্ভব। উপনিবেশপূর্ব গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার দুরমুশ করে শোষণের এক "অনন্ত লুঠের বাথান"কে উন্নয়নকামী সভ্যতার একমাত্র পরাকাষ্ঠা হিসেবে বিশ্বাস করতে বাধ্য করানো হয়। গ্রামীণ উৎপাদন এবং মধ্যস্বত্বভোগী কলকাতার জমিদারদের মধ্যে একটি দীর্ঘস্থায়ী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফাটল তৈরি করে বঙ্গভঙ্গ এবং তার মধ্যে দিয়ে দেশভাগের পটভূমি তৈরি হয়। কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট, হিন্দু মহাসভার সম্মতিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই ঘৃণ্য চক্রান্ত বাস্তবায়িত হয়।

১৯৪৭এর ২০শে জুন তাই একটি রাজনৈতিক নির্মাণ। তা একটি সামাজিক নির্মাণ, সাংস্কৃতিক নির্মাণ। এবং, বিদ্যায়তনিক নির্মাণও বটে।

(খ)

এই আলোচনার প্রথম অংশটি হলো সেই অবিচ্ছেদ্য ভিত্তিভূমি যার উপর দাঁড়িয়ে রূপায়িত হয়েছিল বাংলার ভাগ বাটোয়ারা। এইভাবে দুই টুকরোয় বাটোয়ারা গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ হয়নি। পূর্বে বাংলাকে আর পশ্চিমে পাঞ্জাবকে ভাঙ্গা হয়েছিল। বঙ্গের বুক এফোঁড় করে টানা হয়েছিল র‍্যাডক্লিফ

রেখা। সাতচল্লিশের বিশে জুন, কৃতিত্ব নয়, অঙ্গচ্ছেদেরই স্মৃতি। কৃতিত্বের দাবিদার যাঁরা তাঁদের প্রত্যেকের ভূমিকাই নিন্দার্হ।

জাতি রাষ্ট্রের ক্ষমতার অলিন্দে ঘুরপাক খাওয়া ঔপনিবেশিক শিক্ষায় দীক্ষিত মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের ভোটে বাটোয়ারা হয়েছে আমআদমির বাসভূমি। ঘরছাড়া হয়েছে লক্ষাধিক, খুন ধর্ষণ রাহাজনির শিকার হয়েছে অসংখ্য। একে অপরের প্রতি এক অনন্ত বিদ্বেষের চক্রাবর্তে ঢুকে অনাত্মীয় হয়ে গেছে সকলে। এহেন এক ঘটনাকে সাফল্য বলে ভাবা নেহাতই মূর্খামি।

মূল নথিটির ব্যবচ্ছেদের আগে তার একটা সরকারি সারাংশ দেখে নেওয়া যাক:

> The member at the joint sitting (excluding European members) decided that the province of Bengal as a whole would join a new and a separate Constituent Assembly consisting of representatives of those areas which decide not to participate in the existing Constituent Assembly. Members of the Muslim majority districts (other than Europeans) decided on divisions against partition of Bengal and in favour of joining a new and separate Constituent Assembly; while the members of areas other than Muslim Majority districts (excluding Europeans) decided on divisions in favour of partition of Bengal and framing the Constitution of separated Province consisting of the non-Muslim majority areas in the existing Constituent Assembly.

সরকারি এই সারাংশের শব্দবাজি লক্ষ্য করার মতো। কয়েকটি পদগুচ্ছের ব্যবহার উল্লেখ না করলেই নয়: প্রথমত, মুসলিম নন-মুসলিমের বদলে হিন্দু নন-হিন্দু দ্বিত্বতায় কেন ভাঙ্গা হলো না বাঙালি অস্মিতার বিষয়টিকে? দ্বিতীয়ত, ডিভিশন এবং পার্টিশন শব্দদুটির প্রয়োগ কেন ও কি উদ্দেশ্যে? তৃতীয়ত, সংখ্যা গরিষ্ঠতার নিরিখে ভৌগোলিক সীমানার কল্পনা ঠিক কতটা যুক্তিসঙ্গত?

হিন্দু অ-হিন্দুর দ্বিত্বতায় শুধু মুসলিম নয় আদিবাসী অস্মিতার প্রশ্নটাও উত্থাপিত হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। মুসলিম অ-মুসলিম বললে, সে বিপদ এড়ানোর সম্ভবনা তৈরি হয়।

১৯৪৭ সালের ২০ জুনের বঙ্গীয় আইনসভার কার্যবিবরণীতে (Proceedings of the Bengal Legislative Assembly) "division" এবং "partition" শব্দ দুটি

পৃথক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। Division বলতে বোঝানো হয়েছে সংসদীয় নিয়ম অনুযায়ী অনুষ্ঠিত আনুষ্ঠানিক ভোটাভুটি (recorded vote), যেখানে সদস্যরা পক্ষে ও বিপক্ষে বিভক্ত হয়ে ভোট প্রদান করেন। অন্যদিকে, Partition বলতে বোঝানো হয়েছে বাংলা প্রদেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভাজন, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ, নথির ভাষ্যে division হলো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাংবিধানিক ও সংসদীয় প্রক্রিয়া, আর partition হলো সেই প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ সংঘটিত ভূখণ্ডগত বিভাজন। বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখলে, এই শব্দচয়ন থেকে মনে হতে পারে, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক ভাষ্য বঙ্গভাগকে একটি পূর্বনির্ধারিত রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে নয়, বরং আইনসভার ভোটাভুটির মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিণতি হিসেবে উপস্থাপন করেছে। কিন্তু ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় দেখলে বুঝতে অসুবিধে হয় না, ডিভিশনের নির্মাণে যেমন প্রশাসনিক ভূমিকা রয়েছে, ঠিক তেমনি জাতির নির্মাণ ও তার ভৌগোলিক বিন্যাস নির্ণয়ের মতো বিষয়গুলিরও ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আগ্রহীজন ১৯০১-এর রিসলে নেতৃত্বাধীন আদমশুমারি রিপোর্টটি দেখতে পারেন।

বিভাজনের ক্ষেত্রে খুবই সুপরিকল্পিতভাবে ধর্মের বিষয়টিকে ভাষা সংস্কৃতির থেকে আলাদা করে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে সংখ্যা গরিষ্ঠতার মানদণ্ড হিসেবে। বলার অপেক্ষা রাখে না এই মানদণ্ডটি বদলে দিলে র‍্যাডক্লিফের কাঁটাতার এদিকওদিক হয়ে যেতো। যাইহোক, কাটাছেঁড়ার পর এতে করে যে বিশেষ সুবিধা হয়েছে এমনটি নয়। এর প্রমাণ স্বাধীনতার এত বছর পরেও রাজ্য পুনর্গঠনের নামে রাষ্ট্রের ছুরিকাঁচি চালানো অব্যাহত আছে।

(গ)

অবিভক্ত বাংলার আইন সভার সেক্রেটারি কে. আফজল আলির ঘাড়েই ন্যস্ত ছিল সদস্যদের দিয়ে ভোট করানোর দায়িত্ব। দুইশ পঁয়তাল্লিশ জন সদস্যের মধ্যে ইউরোপীয় ছিলেন যাঁরা তাঁদের ভোটদান থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। পার্টিশনের দলিলটি লক্ষ করলেই বোঝা যাবে ধর্মীয় মেরুকরণের সাথে দ্বিজাতি তত্ত্বের ঔপনিবেশিক কার্যক্রম কি নিখুঁতভাবে বিদেশি এবং স্বদেশী নেতৃবর্গ সেদিন কার্যকর করেছিলেন। ঐতিহাসিক সেই দলিলের শুরুতেই মুসলিম ও অমুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের নেতৃবর্গের নাম ইংরেজির বর্ণানুক্রমে ঠিকানা-সহ আলাদা আলাদা করে দেওয়া।

আইনসভার অধ্যক্ষ নুরুল আমিন ১৪০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে ভোটাভুটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কারুর কোনো দাবিদাওয়া আছে কিনা জানতে চাইলে, তৎকালীন কংগ্রেসের কিরণ শঙ্কর রায়, দুই কক্ষের সদস্যদের একত্রিত করে ভোটাভুটির দাবি তোলেন এবং এই দাবি মান্যতা পায়। প্রসিডিংস অনুযায়ী, মাত্র দশ মিনিটের ছিল সেই প্রাথমিক পর্বের অধিবেশন। সকালের এই অধিবেশনের শেষে, বেলা তিনটের আধ ঘণ্টার অধিবেশনের আয়োজন হয়। উপস্থিত সদস্য সংখ্যা দুইশ উনিশ। সভাধক্ষ্যকে জুড়লে দুইশ কুড়ি। সভাধক্ষ্য বলেন:

> It is now my duty to ascertain whether the Province of Bengal as a whole would join the existing Constituent Assembly or join a new and separate Constituent Assembly consisting of representatives of those areas which will decide not to participate in the existing Constituent Assembly. Those who are in favour of joining the existing Constituent Assembly will go to the "Ayes" lobby and those who are in favour of a new and separate Constituent Assembly will go to the "Noes" lobby. Members may proceed to record their votes.

ফলাফল, Ayes লবি ৯০, Noes লবি ১২৬। পরিষ্কার করে বললে, ভারতীয় সংবিধানের অধীনে অবিভক্ত বঙ্গের পক্ষে ভোট পড়ে নব্বইটি। আর, বিপক্ষে পড়ে একশ ছাব্বিশটি। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি Ayes লবি ভুক্ত। তিনজন কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী সদস্য যথা জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহমিন, এবং রূপ নারায়ণ রায়ের নাম অংশগ্রহণকারী ভোটারদের তালিকায় অনুল্লেখিত।

পরবর্তী অধিবেশন চল্লিশ মিনিটের। উপস্থিত সদস্য সংখ্যা একশ চল্লিশ। সভাধক্ষ্যকে ধরে একশ একচল্লিশ। সভাধক্ষ্য বলেন:

> It is now my duty to ascertain the wishes of this part of the Bengal Legislative Assembly as to whether the province of Bengal should be partitioned or not Those who are in favour of partition will go to the "Ayes" lobby and those who are against it will go to the "Noes" lobby. Members may now proceed to record their votes.

ফলাফল, Ayes পঁয়ত্রিশ, Noes একশো ছয়। এইবার ভোটে অংশগ্রহণকারী ভোটারদের তালিকায় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও তিনজন কমিউনিস্ট সদস্যের নাম

অনুল্লিখিত। কেন? কারণ, এই অধিবেশনে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করেন মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলোর রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা।

তৃতীয় ভোটাভুটি। সভাধক্ষ্য বলেন:

> It is now my duty to ascertain the wishes of this part of the Bengal Legislative Assembly as to whether it will join the existing Constituent Assembly, or it will join a new and separate Constituent Assembly, consisting of the representatives of those areas which decide not to participate in the existing Constituent Assembly. Those who are in favour of joining the existing Constituent Assembly will go to the Ayes" lobby, and those who are in favour of joining a new and separate Constituent Assembly, consisting of the representatives of those areas which decide not to participate in the existing constituent Assembly will go to the "Noes" lobby".
>
> ফলাফল, Ayes চৌত্রিশ, Noes একশ সাত।

এই তিন পর্বের ভোটের মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম বাংলার খণ্ডিত ভবিষ্যতের কালো অধ্যায় রচিত হল। এরপর নির্ধারিত হয় সিলেটের ভাগ্য। ভোটাভুটিতে মুসলিম অধ্যুষিত জেলাগুলোর প্রতিনিধিরা একশ পাঁচ বনাম চৌত্রিশ ভোটে সিলেটকে পূর্ব পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

একই নথির দুই নম্বর পরিশিষ্টে, দেশভাগ নিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত নয় এমন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা করে মতদান পর্ব সম্পন্ন হয়। আটান্ন জন দেশ ভাগের পক্ষে এবং একুশ জন বিপক্ষে ভোগ দেয়। এই পর্বের ভোটে কে কোন পক্ষে মতদান করেন, তার তালিকা B চিহ্নিত পরিশিষ্টে উল্লেখ করা আছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি-সহ তিনজন কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী সদস্য যথা জ্যোতি বসু, রতনলাল ব্রাহমিন এবং রূপ নারায়ণ রায়ের নাম এই তালিকায় উল্লিখিত আছে।

আমার ব্যক্তিগত অরাজনৈতিক ঘ্যানঘ্যান

অর্ঘ্যদীপ সরকার

ত্রিশ দিনের জীবনে বারো দিন মালদায়, বাকিটা কলকাতায় এবং উল্টোটাও এবং সাড়ে আটটায় ঘুম ভেঙে গেলে বাজারের উদ্দেশ্যে; অনিচ্ছাকৃত। কেননা কেনাকাটা থাক বা না থাক, সাবলীল শৌচকর্মের জন্য প্রয়োজন পেশি সঞ্চালন; মর্নিং ওয়াক। ইলিয়াল আলসার, ইরেগুলার পায়খানা, কখনও রক্ত। কিন্তু গাড়ির হর্ণ-মহানগরের মুক্ত বাতাস এবং সকাল নটায় আর যা হোক স্বাস্থ্যচর্চা হয়না। রাজপুর-সোনারপুরের ডুবে যাওয়া পাড়া কিংবা বিদ্যাসাগর কলোনি, মেসবাড়ি, কলকাতায় এই আমার ঠিকানা। পনরো টাকার পটল নিতে দেড় কিলোমিটার হাঁটা; পেশিসঞ্চালন। চেনা মুখ, চেনা বিক্রেতা, ঘাম আর মানুষের দুর্গন্ধ, প্যাচপেচে রাস্তা আর এই শহরে এখন; আবর্জনায়। যে মহিলার থেকে মাছ নিই; অতি উৎসুক, অযাচিত আলাপচারী। শুরুতে ইগনোর করতাম। এখন ফিরতে দেরি হয়ে যায়; বাড়তি বাক্যব্যয়। এবং আমার দেরি হয়ে যাবে বলে সেদিন, বলা উচিৎ বহুদিন, মাছ পরিষ্কার করে নুন হলুদ মাখিয়ে, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের মুখ খুলে ঝাঁকা দিয়ে ঢেকে রাখে। 'আপনার পছন্দ মত মাছ খেয়ে খেয়ে আমি পরাধীন হতে চাইনা!', বলতেই পারতাম, হয়ত খানিক আলাপ জমত এবং ওদিক থেকে নানান উত্তর আসতে পারে; যেমন, 'আ বাবা, মাসে একবার শিঙি জিওল শরীলে না পড়লে...!' আমি কথা বাড়াই না।

ফিরে যাই; চা নিয়ে অনেকটা সময়, ঘন্টাখানেক বা আরও কিছুক্ষণ, দুটো তিনটে সিগারেট। নিজেকে বোঝায়—শেষ তিনদিন সিগারেট ছুঁইনি। পায়খানা পরিষ্কার না হলে দিন খারাপ যাবেই। অতএব অপমান এবং অপমানিত হতে হতে, মানুষের পচা দুর্গন্ধে এই নিয়ম মাফিক জীবন এখন গা সওয়া হয়ে গেছে।

খিদেখিদে মন নিয়ে রোজকার ইউনিভার্সিটি। আর সব নিয়ম যখন মানছিই অতএব তামাক। সিগারেট; সিগারেট; সিগারেট। এরপর যাবতীয় মন খারাপ ধুয়ে গেলে, পড়ে থাকে অ্যাকাডেমিক এইম। ইচ্ছাকৃত এই দাসপ্রথা, পরাজয়, বৃহত্তর সাকসেসের জন্য রোজকার দৈনন্দিন জবাবদিহি। মনোটোনাস জীবন, মানুষের দুর্গন্ধ, ইচ্ছেমত অহেতুক যে কাউকে এলোপাথাড়ি লাথি মারতে মারতে গাঢ় খয়েরি রক্ত বেরিয়ে আসা পর্যন্ত যদি পরপর অনবরত—হয়ত সাময়িক আনন্দ পাওয়া যেত। কিন্তু বাস্তব ব্যর্থতার, অপারগতার। সারাক্ষণ মাথা খিচে থাকে। তবু অনড় অ্যাকাডেমিক এইম, তাই ডেলিবারেটলি ভুলে যেতে হয় সবকিছু, কেননা এই-ই আমাকে আর আমার ভবিষ্যতের ভাবনা, এযাবৎ চাকরির ব্যাগ বওয়ার ইনেলিজিবিলিটি, মাসে আট হাজার-নাকানি চোবানি, বাড়তে থাকা খরচা সমেত দৈনন্দিন হেনস্তার থেকে দেবে স্থায়ী মুক্তি। প্যাচপ্যাচে দুর্গন্ধে, এখনও ব্যর্থতায়, আর এই লাচার সব মানুষের মুখ থেঁৎলে দেওয়ার পথে লাল আলো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুসজ্জিত শৌখিন ভবিষ্যৎ। যে বেড়াল রাস্তা কাটে তাকে পিষে দিতে না পারলে অবধারিত চোঁয়া ঢেকুর; তাই কুকীটের মত, এই নর্দমা থেকে নিষ্কৃতি পেতে, লাগে চাকরি, সাফল্য, সাফল্য আর পরিত্রাণ। তা বাদে আর যা কিছু, আমি ভুলে যেতে চাই!

এই শহরকে আমি ঘেন্না করি, কিন্তু কতটা? এসব অবান্তর আমি জানাতে চাই না, আমি মনে করতে চাই না এখান থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে যে মেয়েটাকে ওরা ফেলে রেখেছে সীমানার ওপারে, খোলা আকাশের নীচে ভরা বর্ষায়, তার নাম। নো ম্যানস ল্যান্ড, না-মানুষের দেশ, এমনই ক্লিশে অনুবাদ চোখে পড়ল কোন চলতি নিউজ পেপারে, দশ লাইনের প্যারাগ্রাফ। ফেসবুক স্ক্রল করলে হঠাৎ 'খাওয়া নেই দাওয়া নেই গা ধোয়া নেই সারাদিন এভাবে পথে ঘাটে…', ভিডিয়োয় একটা দশ বারো বছরের রোগা কালো মেয়ের ঘ্যানঘ্যান, তাতে কয়েকশো হাজার লাইক! সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যান্টিসোশ্যাল সার্কাস। এসব ড্রামা চোখে পড়লে সাধারণত এড়িয়ে যাই। সেদিন চোখ আটকে গেলে মনে পড়ল সে মহিলার কথা, যার জন্য সস্তায় বেশ ক' মাস আমার মাছে-ভাতে কেটেছিল; শেষমেশ ব্যবসায় লাভ হল-না বলে দোকান গুটিয়েছে, নইলে আজ তার শিঙি মাগুর মুক্ত কণার মত বুলডোজারের তলায়, উচ্ছ্বাসে, কী মাইন্ডব্লোইং দৃশ্য! লাতখোরেরা লাথি খেয়ে খেয়ে মুক্ত, বেওয়ারিশ! এরাই রোহিঙ্গা, এরাই লুকিয়ে থাকে হকার, শ্রমিক সেজে; সূক্ষ্ম অভিনয়; কেউ পেট

ফাঁপিয়ে গর্ভবতী—কেউ বৃদ্ধা লোটে শুটকির অসহ্যকর শুকানো যোনীগন্ধ নিয়ে, অথবা সেই হাড় বেরানো মেয়েটা; একে একে এ সব জঞ্জালকে ম্যারিনেট করা হবে। লবণে-হলুদে, বৈধ আগ্নেয়াস্ত্রে, যুগোপযোগী, মানচিত্র সুরক্ষায়! একটা আবর্জনাহীন ফুটপাত, যেমনটা আমি চেয়ে এসেছি। কতটা সময় অলরেডি নষ্ট করে ফেললাম এ চক্করে। মেয়েটার আওয়াজ ইরিটেটিং—এখনও কানে বাজছে!

এ পর্যন্ত পড়লে মনে হতে পারে, আমি এক্সাজারেট করছি অথবা এতটাই ব্রুটাল এবং কোনটাই নাকচ করতে চাই না; তবে অবশ্যই আমি ভিতু। সামান্য, একটা শামুক সেদিন বাইকের তলায় চলে এসেছিল বলে জিভ কাটলাম, এটা আমার ভালোমানুষি নয়, এমনকি পাপপুণ্যের দুশ্চিন্তা! অহেতুক হাতে রক্ত মাখতে আমি চাইনি বরং চেয়েছি নিষ্কলঙ্ক জীবন, সকলের সামনে ভালো সেজে থাকা, কেন না এই-ই প্র্যাগমেটিক, প্র্যাকটিকাল, এতে সুসজ্জিত ভবিষ্যতের সম্ভাবনা খানিক বেড়ে যায়। সাফল্যের জন্য মেপে মেপে পা ফেলাকে যারা মেনে নিতে পারে না, তারা আমাকে কাপুরুষ ভাবতেই পারে; আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত নই। আমার সামনে পড়ে আছে আর কটা বছর, সরকারি চাকরির সুবর্ণ-স্বপ্নময় ভবিষ্যৎ! বিশ পার্সেন্ট ডিএ, ক্লাস টেন অবধি দুর্দান্ত অঙ্ক করেছি আমি আর অসংখ্য স্টেপ জাম্প, তারপর দু-বছরের দীর্ঘ প্রতিযোগিতা, তবু সমস্ত ফর্মূলা ভুলে এখন; তবু মাথায় গেঁথে থেকে গেছে স্টেপ জাম্প! জীবনের যাবতীয় বিভ্রান্তি ভুলে, স্যোশাল এসট্যাবলিসমেন্ট, সামাজিক উন্নতিতে যা যা বাধা হয়ে দাঁড়াবে এমন সবকিছুই ভুলতে হবে! এই পচে যাওয়া মানুষ, ঘাম আর এদের দুর্গন্ধ থেকে চাকরির, প্রতিষ্ঠার টলটলে স্বচ্ছ জীবনে এই আমার সফল স্টেপ জাম্প! 'খাওয়া নেই, দাওয়া নেই, গা ধোওয়া নেই'! বুলশিট! এদের কালো মুখ, আর আরও ইরিটেটিং এদের থটলেস থিয়েটার! মোল্লার বাচ্চা, তোমার বাপ ঠাকুরদা কোরাপটেড গভমেন্টকে পয়সা খাইয়ে আঁধার কার্ড লিয়েছে আর তুমি ন্যাকামি জুড়েছ! এ সরকারের আমলে সব ধ্যাসটামো ধুয়ে যাবে! ভিডিয়োটা ক'দিন আগেও চোখে পড়েছিল; দু-সেকেন্ডের বেশি দেখিনি, যতদূর মনে আছে কোনো তাড়া ছিল না; তবু। কিন্তু এই সপ্তাহটা আমার নির্ঝঞ্ঝাট ভবিষ্যতের পরিকল্পনাকে খানিক তছনছ করে দিয়ে গেল। যদিও সাময়িক, কেন না যে পাখির চোখ আমি দেখেছি, তাকে শরবিদ্ধ করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আশ্চর্যের বিষয় আমি এখনও এই নিয়ে ভেবে যাচ্ছি! সিগারেট; শেষটান।

প্রসঙ্গটা উঠেছিল হপ্তা তিনেক আগে, বিলুদার দেড়তলার বদ্ধ ঘরে। বলা বাহুল্য স্ট্যান্ড ফ্যানের হাওয়া কোনোভাবেই গায়ে লাগছিল না। বিপ্লব নায়ক, কোনো সরকারি চাকরি করেন না, প্রভাব প্রতিপত্তি নেই, ফলত আমার তরফ থেকে আলাদা করে শ্রদ্ধা ভক্তির কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। মুশকিল হল লোকটা সে দাবিও করেনা, যা ইরিটেটিং; বয়স পঞ্চাশোর্ধ এবং অগুন্তি বই দিয়ে নিজের কফিন সাজিয়েছেন, কিন্তু পেরেক পোঁতেননি কারণ মাঝে মধ্যেই ওকে বেরিয়ে যেতে হয় গ্রামেগঞ্জে। এর বেশি খুব কিছু বলতে পারব না, আগ্রহ হয়নি। আমি যাই মূলত কিছু বই নিতে, পিএইচডি'র বইপত্র অত্যন্ত এক্সপেন্সিভ, পরিবর্তে লোকটা কিছু চায় না। সেদিন শুরু থেকেই ওকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল, বাইরে অঝোরে বৃষ্টি, ফলত বেশ কিছুক্ষণ আটকে গেলাম। চা এল আর কটা খবরের কাগজ। মালদায় নাকি একটা হোল্ডিং সেন্টার খোলা হয়েছে; বিএসএফ, পুলিশ, ইন্টেলিজেন্সের লোকজন বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের ধরে ধরে সেখানে চালান করছে, এদের মধ্যে রয়েছে বেশকিছু কিশোরী নাবালিকা, অন্তঃসত্ত্বা মহিলা; এরপর এদের পুশ-ইন করা হবে বাংলাদেশ বর্ডারে। আঃ! এটা অবশ্যই সেলিব্রেট করা যায়, দু-পেগ বাংলা, অবিভক্ত। ওর উদ্বেগের কারণ আমার কিছুই মাথায় ঢুকল না। বিলুদা বলে চলেছিল কিছু অর্থহীন বাক্য। ভাবলাম ওকে একটা জোক বলি, 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় বাগদী বেগমদের লুকোচুরি খেলবার দিন', এই থিমে পুরু ক্যানভাসে সুবর্ণ রেখায় সেগুন-কাঠের তুলি দিয়ে ছবি আঁকছেন প্রখ্যাত চিত্রকর ঋত্বিক ঘটক'; শেষ মুহূর্তে আটকে গেলাম; সিগারেটটা তখনও আমার আঙুলে আর তখনই আমার চমকে ওঠার পালা; বিলুদা মালদা যেতে চায়, আর সে দায়িত্ব এসে পড়তে চলেছে আমার ঘাড়ে।

সেদিন রাতে ঠিককরে ঘুম হল না। ভেবেছিলাম বাড়ি ফিরে কিছুদিন নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে শোব, সে গুড়ে বালি। যদিও বিষয়টা কাটিয়ে দেওয়াই যেত কিন্তু মুশকিল হল বিলুদা, প্রভাব প্রতিপত্তিহীন বিপ্লব নায়ক, আমার পিএইচডি গাইডের বন্ধু, ফলত অযথা বিষয়টাকে ঘাঁটানো উচিত মনে হয়নি। আমিও আমার সিরিয়াস সুচিন্তিত সংহতি জানালাম, বাধ্য হলাম।

২

শনিবার বিলুদা এলেন, আমি উৎকণ্ঠায়, বেশ কদিনের জন্য মালদায় আমার সুখের সফরে শরশয্যার ভরপুর আয়োজন, ভেস্তে যাওয়া ভ্যাকেশন: 'ঈশ্বর

আর আমাকে রোহাই দিলে না!' মানুষ ভাবে এক আর হয় আরেক। ঈশ্বরের কোন অভিসন্ধি নেই, ঘটমানতা তাঁর অন্ধচোখে সাজানো তাসের আর্বিট্রারি মিক্সিং। কিন্তু ঈশ্বর অন্ধ হলে, আমি কোন পাখির চোখ উদ্দেশ্য করে, এতদিন হেঁটে গেছি এই ভেবে যে একদিন শরবিদ্ধ করবই? ভবিষ্যত এতটা ঠুনকো হতে পারে না, অন্তত আমাকে তার জন্যে শেষতক লড়ে যতে হবে, আমার স্ট্রাকচারাল ভাবনার যথাযথ অ্যানালিসিস, সুবিচার, এই উঠতি পোস্ট মর্ডান ফুটো মস্তানেরা কী করবে বা এই সন্ত্রাসী নিহিলিস্টরা, মানবদরদীরা; এই রবিবাবুর নাঁকি নাঁকি গান! আর আমি অবাক হই মানুষ এখনও এসব তত্ত্ব কথায় ফানি এঙ্গেলস্ খুঁজে পায় না! ঈশ্বর অন্ধ হলে এদের মঙ্গল করতেন, তিনি তা নন, অসীম ক্ষমতা তাঁর, পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ, প্রাণী, এমনকি জীব এমনকি ধূলিকণা মুক্ত নয়, সবই তাঁর ছন্দে নাচে। আমরা যারা সফল বেহুলা, নৃত্যরত, ইন্দ্রের সভায় ঘুঙুর ছিঁড়ে গেছে তবু পৃথিবীর রঙিন রূপ দেখব বলে এখনও ঢোক গিলে আছি; ঈশ্বর আমাদের, তিনি অন্ধ নন, কেন না তিনি লিখছেন যুক্তির ইতিহাস, বুদ্ধিমানের ইতিহাস, ডারউইন ঈশ্বরবাদী এবং উল্টোটাও এবং তাঁর ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর অন্ধ নন, রিয়ালিস্ট, প্র্যাকটিকাল, প্র্যাগমেটিক, তিনি লিখেছেন ঠাফ শক্তিশালী সারভাইবার, ফিটেস্টদের ইতিহাস। হে ঈশ্বর— আমার ইলিয়াল আলসার, রক্ত পায়খানাঃ আপনি দয়াশীল, চোখ মেলুন।

শনবার বিকেলটা যদিও খুব খারাপ কাটল না; মালদায় আমি পৌঁছে গিয়েছিলাম সাতদিন আগেই, আর সেদিনই প্রথম বাইরে পা রাখলাম, বাড়িতে আমি কী করি—সে কথা কোনো গর্দভই জানতে চাইবে, কেননা সুসজ্জিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখা ছাড়া, সমস্ত কাজ, ভাবনাই আমার কাছে অবান্তর, সুতরাং সেসবে ডেফিনিট ইগনরেন্স! যেহেতু বুঝেই ফেলেছিলাম কটাদিন অহেতুক সময় নষ্ট হবেই বোগাস বুদ্ধিহীন কাজকর্মে, তাও সত্যি কথা বলতে আমি হলফ করে বলতে পারছি না ঠিক কী জন্য, সেদিন বিকেলটা খুব বাজে কাটেনি। স্কুলজীবনের দু-তিনটে বন্ধু-হঠাৎ ফোন, স্কুটি চেপে শহর থকে দশ বারো কিলোমটার দূরে, অজ পাড়াগাঁয়ে নদীর ধার, তামাক, ইত্যাদি; অন্যদিন হলে ব্যস্ততা দেখাতাম, সেদিন চেপে গেলাম। বিলুদার ফরমায়েশ ছিল গ্রামে গ্রামে ঘুরে, 'SIR' এ নাম বাদ গেছে যাদের; তাদের সাথে খানিক কথোপকথন, এমনই অযৌক্তিক আরও কিছু বোধহয়। যাইহোক সে গ্রামের নামও মনে নেই, ভুলে গেছি; স্বাভাবিক, আর তামাক তো ছিলই; অণামিত্র, কাশ্যপেয় বাগান

থেকে একগাদা আম ভেঙে আনল, তা থেকে সাদা চটচটে বিষাক্ত আঠা, বিরক্তিকর, ডেঞ্জারাস, আমার পলিশড্ চামড়ায় তখন ভয়; বাজেভাবে ধ্যাতানি দেওয়া যেত, যদিও কিছুই বলিনি; কোনো প্রত্যন্ত চায়ের দোকানে সেদিন বিস্বাদ চা খেতে খেতে মনে হচ্ছিল কবেকার ইতিকথায় আমি, যেন সময়ের কোন বিচ্যুত ফ্র্যাগমেন্টে, যেখানে যুক্তি নেই, তাই না পাওয়া আছে বিস্তর, দুশ্চিন্তা আছে কিন্তু কোন অদ্ভুত-সঙ্গীতে ঢাকা পড়ে আছে ভবিষ্যৎ, তার সংশয়, কীভাবে তারা সেসব ভুলে, মানুষের মতই বেঁচে আছে, হয়ত অহেতুক, কিন্তু কীটের মত হয়ত নয়, সত্যি কথা বলতে আমি হলফ করে বলতে পারব না কেন সাম্ভাব্য বিরক্তিকর বিকেলটা খুব খারাপ কাটেনি!

শহরে ঢুকলাম তখন সন্ধ্যে, কোনো বিপথগামী সুরের ঘোর আমাকে ভর করেছিল, শরীর আরও হালকা, আমার মখমলে মোড়া ভবিষ্যতের ব্লু প্রিন্ট ঝাপসা হয়ে এসেছে, পকেটে হাত—তবু সিগারেট মিইয়ে গেছে যেন; ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পৌঁছনোর ছিল গৌতমবাবুর বাড়ি। বয়স্ক ভদ্রলোক, পাঁচ ফুট এগারো, ছিপছিপে শরীর, ক্লিন সেভ মুখে সাদা ভারি গোঁফ। মালদার কোন গ্রাম আমি চিনি না, চিনবার কথাও নয়, কোথায় কত মানুষ বাদ গেছে ইত্যাদি ভরা ভোটের বাজারে আমি কাকে জিজ্ঞাসা করব? বিলুদার এসমস্ত কাণ্ডজ্ঞানহীন কৌতূহল, প্রশ্ন আমার সিভিয়ার ইনসমিনিয়া ডেকে আনলে, হঠাৎ মনে পড়েছিল গৌতমবাবুর কথা। আমি যখন ক্লাস এইটে, লোকটাকে শেষ দেখি, রিটায়ারমেন্টের দিন পদার্থবিদ্যার এই শিক্ষকের প্রস্থানে, ছেলেপিলে বলাবলি করছিল ওর একদা নকশাল রাজনৈতিক পরিচিতি নিয়ে কিছু একটা। শব্দটা তখনই প্রথম শুনেছিলাম। পরে জেনেছিলাম এরা ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনে ব্যর্থ এবং শুধুমাত্র ব্যর্থতার সফল অনুশীলন চালিয়ে যান। ভুল ভাঙল সেদিনই; বসবার ঘরে প্রতিবাদ, প্রতিরোধের বেশকিছু বই, আনমনে নাড়ছিলাম, অন্যদিন হলে বাড়ি এসে স্নান করতাম! যাইহোক, কাশ্যপেয় রুগ্ন মুখে নিট, সিজিএল আরও কী কী সব পরীক্ষায়, সরকারি ঘাপলার পরিসংখ্যান দিচ্ছিল, পুওর পিপল কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড বিজনেস; ওকে মনে মনে ক্ষমা করলাম। বিষয়টা উদ্বেগের হতে পারত, কিন্তু কাশ্যপেয় পিএইচডি পাইনি, ফলত ওকে নিজের প্রতিযোগী মনে করাটা ফালতুই হবে। কিন্তু ভুল ভাঙল তখন, যখন শুনলাম গৌতমবাবুর ওয়াইফ অধ্যাপনা করেন এবং মেয়ে বিদেশে পোস্ট ডক্; কিন্তু এও সম্ভব! অঙ্ক মেলাতে দুটো সাম্ভাব্য ইকুয়েশন হতে পারে এই

যে, সমাজ-গরিব-জঞ্জাল-বঞ্চিত এদের নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা বিদেশযাত্রায় বাধা হতে পারে না; অথবা দুই, উনি মিথ্যে কথা বলছেন! অথবা দু-একটা ব্যতিক্রমই যে সংজ্ঞার ভিত শক্ত করে তা আমি ভালোই জানি। শুধু জানি না কীজন্য আমি সেই সেকেলে ম্যাদামারা অর্থহীনতার অংশ হয়েছিলাম! আপনারা জানেন, বাধ্য হয়েও, তাও বলব সেই বিপথগামী সুর...। সেদিনও ঘুম হলনা; দুঃস্বপ্ন গৌতমবাবুর নীচতলার ঘরে প্রতিরোধের বই সেখানে গঙ্গা ভাঙন, একদল যাযাবর আদিবাসী সেখানে কখনও ঝাড়খণ্ড কখনও এই বাংলায় নদী ধরে ধরে, তাদেরই কোনো শিশুর কালো মাথা ভেসে যাচ্ছে, আর উনি বলে যাচ্ছেন পঞ্চানন্দপুর, মালদায় গঙ্গা ভাঙনের দগদগে ইতিহাস, ফারাক্কা ব্যারেজ, বাংলাদেশ, ভারত, জল-ব্যবসা। মেলোড্রামা আমার পোষায় না। ভারি মাথা নিয়ে উঠে পড়লাম। সিগারেট।

রোববার সকালে ওদের মিটিংয়ে আমি যাইনি। এগারোটায় ফোন হাতে নিলে, বিলুদার সাতটা মিসড্ কল। যাওয়া হবে কোন্ এক গাঁয়ে; কাশ্যপেয়, বিলুদা আরেক জন, তখনও অপরিচিত; ফোনে বিলুদা নিরুত্তাপ, জানতে চাইল আমি যাব কিনা। কোনমতে তড়িঘড়ি। ওরা দাঁড়িয়েছিল আইটিআই মোড়ে, বাইকে আমি যখন পৌঁছলাম, বারোটা। অপরিচিত খিদিরবাবু আমার বাইকে, কাশ্যপেয়'র স্কুটিতে চাপল বিলুদা। দেরি হওয়ায় খানিক অপরাধ বোধে ভুগছিলাম বলেই হয়ত বাড়তি আলাপচারিতা জমে উঠল। ছেলে ডাক্তার, মেয়ে কলকাতায় থাকে। নদী ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির খিদির বক্স ব্যক্তিগত কত কথা বলেছেন সেদিন, আমিও ঘুমহীন অথচ ফুরফুরে; মুসলিম হলেও ওকে আমার খারাপ লাগেনি। সামঞ্জস্য বজায় রাখতে ব্যতিক্রম আর সংজ্ঞার উদাহরণ আমি আগেই দিয়েছি।

টানা দেড় ঘন্টা পর যে গ্রামে পৌঁছলাম (নাম মনে নেই), গ্যারাজের পাশে বৃদ্ধের প্রায় বন্ধ করে দেওয়া দোকান খুলিয়ে চা খাওয়ালেন, আমি শুধুই সিগারেট। পাশেই শাটার নামিয়ে নমাজ পড়ছিলেন, শেষ করে খিদিরবাবুর ডাকে ভদ্রলোক বসতে দিলেন। তরিকুল ইসলাম। গয়নার দোকানের চারদিকে আয়নার কাচ তাতে সরু রাস্তার ওপারে মন্দিরের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট, উনি বসেছিলেন পুরনো জমিদারের ক্ষয়ে যাওয়া সিংহাসনে। পুরোটাই আমার কল্পনা হয়ত, বা হয়ত নয়। রাস্তার ওধারে ইলেকট্রিক পোলের ধার ঘেঁষে পনেরো ডিগ্রি হেলে থাকা উদ্ভট সে স্থাপত্যে দুপুরের রোদ যখন ঠিকরে পড়ছে, বোঝাচ্ছিলেন

গ্রামেগঞ্জে ভোট কীভাবে হয়! খিদিরবাবু কি খানিক বাধ সাধতে চাইলেন? তরিকুল ইসলাম রাখঢাকের ধার ধারেন না, পরিবারে শুধুমাত্র ওরই নাম কেটে গেছে SIR-এ, উনি আপ্লুত, এইজন্য যে, ছেলে মেয়ে বউকে হ্যারাশড্ হতে হবে না আর, আর ওকে ডেকে পাঠালে আদালতের ভরা বিচারসভায় একে একে দেখাবেন উনিশশো পঞ্চাশের, তেত্রিশের জমির দলিল, এদেশের, এই ভারতবর্ষের। তবু এ নিগ্রহ কেন? বিচারকের জবাবদিহির অপেক্ষায় উত্তেজিত তরিকুলবাবু কি আবার খানিক মুষড়ে পড়লেন যখন বিলুদার কথায়—প্রসঙ্গ এই যে, বাদ পড়ে যাওয়া একানব্বই লাখ লোককে নিয়ে সরকারের কোনো হেলদোলই নেই, শীতঘুমে জবুথবু বিচারব্যবস্থা, শুধু উত্তুঙ্গ উদ্যোগে চলছে পছন্দসই মানুষদের বেছে বেছে হোল্ডিং সেন্টারে পাঠানো আর সেখান থেকে বর্ডারের ওপারে ছুড়ে ফেলা, জানি না। সে গ্রামে আরও দশ হাজার লোকের নাম বাদ গেছে, সবাই তরিকুল ইসলামও নয়, স্বর্ণ ব্যবসায়ীও নয়। ফেরার পথে এক বাচ্চা ছেলে দু-হাতে আম কুড়িয়ে ফিরছিল, বাইক থামিয়ে দুটোই চাইলাম; বলল 'একটা লেন?', বললাম 'লাগবে না'; হাতে আম দুটো দিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছে সে গেঁয়ো ছোঁড়া। চোখে ধুলো পড়েনি; বুঝলাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছি।

বিলুদাও গতকাল ফিরে গেল। আজ সকালে রক্ত পায়খানা; গৌতমবাবুকে নিয়ে হোল্ডিং সেন্টার দেখে এলাম, উনি জোর করেননি, তবু। পাঁচতলা বাড়ির নীচে বহু প্রজাতির পুলিশ মোতায়েন, কেউ কোনো প্রশ্নের উত্তর দিল না। একেবারে উপরের তলায় আমারই বয়সি কিছু ছেলেপিলে আমাদের দেখে জটলা বেঁধে এগিয়ে এসেছে গ্রিলের ওধারে, দূরত্ব অনেক, তাই শব্দহীন সেই আর্তনাদ শেনা সম্ভব হয়নি। হয়ত ওদের পাচার করে দেবে আগামীকাল বা পরশু, মুক্ত কণার মত, আর আমি তো এতকাল চেয়েছি এই-ই; সাফ, স্বচ্ছ ফুটপাত, বুলডোজারের তলায় সে মহিলার মুক্ত শিঙি-মাগুর, হিন্দুস্তানের মানচিত্রের ওপারে সমস্ত লাথখোরেরা, স্বাধীন মোল্লার বাচ্চারা এদিক ওদিক।

তবু কোন্ বিপথগামী সুর আমাকে তছনছ করে দিয়ে গেল? আমার সফল স্বপ্নময় ভবিষ্যত, আমার একমাত্র লক্ষ্য, আমার উদ্দেশ্য আবছা হয়ে আসছে। হে ঈশ্বর আপনি সহায় হোন, আপনি অন্ধ হতে পারেন না।

র‍্যাডক্লিফ রেখা দিয়ে বাংলাকে চিরে দুপারের হাজার হাজার মানুষকে ঠাঁইহারা করা হয়েছিল। দেশ হারানোর যন্ত্রণা তখন থেকেই বাঙালির নিত্যসঙ্গী। আর সেই যন্ত্রণার ওষুধ বলে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, অবিশ্বাস, হানাহানি, দাঙ্গার বিষ সরবরাহ করে গেছে ক্ষমতার কারবারীরা। আজ একদিকে সেই যন্ত্রণাময় ব্যাধিকেই আত্মপরিচয়ের সোপান বলে হাজির করা হচ্ছে, ভাষা-মাটি-নাড়ি-র টানে বাঁধা আপনজনেদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র তুলে নেওয়াকেই দেশভক্তি বলে জাহির করা হচ্ছে। কেবল মতবাদে শান দিয়ে ভবিষ্যৎ দাঙ্গাকারী প্রস্তুত করা নয়, ফলিত প্রয়োগে বর্তমানে 'হোল্ডিং সেন্টার' নামে জেলখানাও চালু হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গের জেলায়-জেলায়। গরিব মুসলমান মানুষদের ধরে কোনো বিচারের তোয়াক্কা না করে আটকে রাখা হচ্ছে, সীমানা পেরিয়ে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে ওপারে, হাজারে-হাজারে...

হ্যাঁ, সন্ত্রাসী শাসন চোখ রাঙিয়ে পাঁয়তারা কষছে নানাভাবে। কিন্তু প্রলয় ঘটলে কি সবাই অন্ধ হয়ে যায়? অন্ধ হলে তো প্রলয় বন্ধ হয় না। তাই এই প্রতিরোধের চটি-বই পুস্তকমালার দ্বিতীয় বই। পক্ষে/বিপক্ষে আপনাদের চিন্তা-ভাবনাগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াতে চাই আমরা।